অগ্নিদিনের কথা ও কাহিনী

সতীশ পাকড়াশী

সম্পাদনা : শান্তিময় গুহ

প্রাপ্তিস্থান

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

প্রকাশক :
শান্তিময় গুহ
গভ. হাউসিং এস্টেট
ভি. আই. পি. রোড
ব্লক-ইউ, ফ্ল্যাট-এক
কলিকাতা-700054

মুদ্রাকর :
মন্মথ সিংহ রায়
রূপলেখা প্রেস
২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-700009

সূচীপত্র

যৌবনে কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে অনেকেই রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে এসে পড়েন কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকেন খুব কম ব্যক্তিই। যাঁরা থাকেন তাঁরা ইতিহাসের মানুষ হিসেবে পরিচিত হন। সমাজে তাদের সংখ্যা কম হলেও সহস্র জনের কাজ তাঁরা একাই সম্পন্ন করেন; দশজনে যে কাজ করতে সাহস পায় না, সে কাজে তাদের সাহসের কখনো অভাব হয় না। সতীশ পাকড়াশী রাজনীতির জগতের এমনই এক বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। কিশোর বয়সে একদিন, বোমা পিস্তল দিয়ে রাজনীতিতে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন, তারপর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একটানা রাজনীতির কর্মময় জীবন যাপন করে গেছেন।

পার্টি ছিল তাঁর কাছে চোখের মণির মতো, পার্টির স্বার্থ ছিল তাঁর কাছে ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১৯৭২ সালে, ইন্দিরা কংগ্রেসের দ্বারা সারা পশ্চিমবঙ্গে যখন সন্ত্রাস, হত্যা আর নিপীড়নের এক অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল, প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তিনি প্রায়ই বলতেন—পার্টি বললে এখুনি আমি সবকিছু ছেড়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাব। এই বৈপ্লবিক চেতনাবোধ ও কর্তব্যজ্ঞান তাঁর সব কাজের পিছনে সব সময় সক্রিয় থাকত। তাঁর কাছে ছোট বা বড় কাজ বলে কিছু ছিল না; সব কাজই ছিল বিপ্লবের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেখা যায় নেতৃত্বের পদে অথবা সাধারণ কর্মীর স্তরে যখন যে অবস্থায়ই ছিলেন, তাঁর ওপর যে কাজের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকত, তা' সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টার কোন ইতরবিশেষ হত না। মধ্য তিরিশের যুগে যখন তিনি সন্ত্রাসবাদ পরিহার করে সাম্রাজ্যতন্ত্র-মতবাদ গ্রহণ করলেন, তখন তিনি অনুশীলন দলের একজন সর্বোচ্চ স্তরের নেতা ছিলেন। তৎসত্ত্বেও "অনুশীলন" দল ছেড়ে, কমিউনিজমের আদর্শ গ্রহণ করে, একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। আদর্শের প্রতি অবিচলতা, আত্যন্তিক নিষ্ঠা কত গভীর হলে নেতৃত্বের স্থান থেকে সাধারণ কর্মীর স্তরে নেমে যাওয়াকে সহজভাবে মেনে নেওয়া যায়, তা অন্যের পক্ষ কল্পনা করা কঠিন। আমাদের দেশে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নেতৃত্বের স্তর থেকে তাঁদের যখন

সরে যেতে হয়েছে, তখন তাকে সহজভাবে তাঁরা মেনে নিতে পারেন নি, ফলে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তা'ছাড়া, মা কালীর সামনে রক্ত তিলক কেটে, গীতা স্পর্শ করে একদিন যাঁরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে সমাজতন্ত্রের মতবাদ গ্রহণ করা, ঈশ্বর থেকে নিরীশ্বরে, আস্তিক থেকে নাস্তিকে পরিণত হওয়া যে কত কঠিন, কী অসম্ভব মনের জোর ও আদর্শ-নিষ্ঠা থাকলে যে তা করা যায়, যাঁরা তা করেছেন তাঁরা ছাড়া অপরের পক্ষে তা' চিন্তা করাও অসম্ভব। বিপ্লবের সঠিক পথ জানা, বোঝা ও আবিষ্কার করা এবং বৈপ্লবিক সত্যের কাছাকাছি পৌঁছবার নিরন্তর চেষ্টাই তাঁকে জাগতিক ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছে। সেইজন্য রাজনৈতিক উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, বাঁক ও মোড়ের জটিল আবর্ত অতিক্রমে, বিপ্লবের সঠিক পথ গ্রহণে তাঁর কখনো ভুল হয়নি। ১৯৬২ সালের পর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে, মত ও পথের যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে বহু পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ নেতা ও কর্মীর মধ্যে পথ নির্বাচনে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিয়েছিল কিন্তু সতীশ পাকড়াশীর মনে তার কোন ছাপ ছিল না। সংশোধনবাদীদের ত্যাগ করে, সঠিক বিপ্লবের পথ, খাঁটি বৈপ্লবিক পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধা করেন নি। আবার ১৯৬৭ সালে অতিবাম ও হটকারী রাজনীতির আমদানীকারী নকশালপন্থীদেরও সমভাবেই বিচ্ছিন্ন করতে পিছপা হন নি। যাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি কাজ করছে, তাঁদের স্বীয় মত ও পথে আনতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরন্তর ছুটে বেড়িয়েছেন। বয়স, শারীরিক অক্ষমতা ও অসুস্থতাকে গ্রাহ্য করেন নি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানের আলো এই ভাবে তাঁকে আদর্শবান নেতা ও কর্মী হতে, বিনয়ী ও নম্র ব্যক্তিত্বলাভে সহায়তা করেছে।

বিশ শতকের প্রথমভাগের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সম্পর্কে আমাদের মনশ্চক্ষে এক ধরনের পৌরুষদীপ্ত বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা-ছবি ভেসে ওঠে। এই ছবি মনে একে যাঁরা সতীশদার সাথে দেখা করতে আসতেন তাঁরা প্রথমেই ধাক্কা খেতেন; কল্পনা আর বাস্তবের দুস্তর ব্যবধান দেখে বিস্মিত হতেন। কিন্তু কথাবার্তা কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁরা অনুভব করতেন, এই সদালাপী, সরল, সাদাসিদে, ক্ষীণকায়, ছোটখাট মানুষটির সাধারণ আটপৌড়ে কথাবার্তার অন্তরালে একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি অবস্থান করেছে যা,

সামাজিক বৈষম্য, অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে, শোষণ নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে চাইছে। তাঁরা গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষা করতেন, সতীশদার মুখে তাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী শুনতে। কিন্তু এ ব্যাপারে সতীশদার ছিল প্রবল অনীহা। বরং অন্যান্য বিপ্লবীরা, তাঁর সহকর্মীরা কে কত বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছে, তার কাহিনী সবিস্তারে ও গর্বের সাথে বলতেন। তাঁর এই অহমিকা বর্জিত, আত্মপ্রচার বিমুখ-চরিত্র সকলকেই মুগ্ধ বিস্মিত করত। তাঁর কাজই তাঁর পরিচয় ছিল।

সতীশ পাকড়াশী সম্পর্কে কমরেড মুজাফফর আহমদ, গণেশ ঘোষ, সুধাংশু দাশগুপ্ত, নির্মল মৈত্র যা বলেছেন, তার বাইরে নতুন করে বলার কিছু নেই [এই গ্রন্থের শেষে সংকলিত]।

সতীশদার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তাঁর বিভিন্ন লেখা নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু না না কারণে তা প্রকাশে বিলম্ব হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই সংকলন এতদিনে প্রকাশ করা সম্ভব হল।

সতীশদা একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেগুলি ছড়িয়ে আছে। বহু লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, কিছু কিছু লেখা গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে পাওয়া গেছে, সেজন্য সে লেখাগুলি এই সংকলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। আশাকরি ভবিষ্যত সংস্করণে তা দেওয়া সম্ভব হবে।

এই সংকলন প্রকাশের একটা প্রধান কাজ—লেখা সংগ্রহ, ডাইরীর অনুলিখন করা প্রভৃতি কমরেড নির্মল মৈত্র করে আমার কাজকে বহুলভাবে সহজ করে দিয়েছেন। বন্ধুবর কবি শ্যামসুন্দর দে সতীশদার এবং কমরেড মুজফফর আহমদ-এর গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দিয়ে এবং নানাভাবে সাহায্য করে উপকৃত করেছেন। কৌশিক বসু এবং 'ধূসর মাটি' [বীরভূমের] পত্রিকার সম্পাদক লেখা সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ! আমার দুই ছেলে শ্রীমান সমুদ্র ও সংগ্রাম, তাঁদের দাদুর লেখা অনুলিপি করে দিয়ে, দাদুর প্রতি তাঁদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। সেজন্য তাঁদের প্রতি আমার স্নেহাশীর্বাদ রইল।

শান্তিময় গুহ
২০. ৯. ১৯৮৩

শুদ্ধি পত্র

[একটা কথা কাছে—প্রেসের ভূত। শুদ্ধ করতে নির্দেশ থাকলেও, মুদ্রণের পর দেখা যায় শুদ্ধ হয়নি আবার নির্দেশমত যা শুদ্ধ হল দেখা যায় সঠিক অক্ষরের পরিবর্তে অন্য অক্ষর বসেছে—ফলে ভুল-ভুলই রয়ে গেল। এই গ্রন্থেও তেমন ভুল রয়েছে। তবে যে কটা উল্লেখ না করলে নয়, এখানে সে কটা করলাম।]

	আছে	হবে
১।	২ পৃষ্ঠার নীচ দিক থেকে চতুর্থ লাইনের স্থরুতে—‘কথা’।	কথা
২।	২৮ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে—পাকরাশী।	পাকড়াশী।
৩।	৪১ ” নীচ থেকে চতুর্থ লাইনে—পাকড়াশীর।	পাকডাশী
৪।	২৪ ” ” ” —আবারি	আবার
৫।	৫২ ” শেষে —স্থধাশু	স্থধাংশু
৬।	১০০ ” ১৯ লাইনে —negleted	neglected
৭।	১২১ ” ১৭ লাইনে —dlolsion	dicision
৮।	১৪১ ” ১০ লাইনে —DJR	DIR
৯।	১৪৪ ” নীচ থেকে দ্বিতীয় লাইনে —স্থস্থ, পথ	শুদ্ধ, পথ
১০	১৬০ ” ” ” ” ” দেশতিষৈতী	দেশহিতৈষী

আমার কথা

উষার রঙীন আলোর মতই একদিন বাংলার বুকে জ্বলে ওঠে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম রক্তশিখা। শতাধিক বৎসরের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের কঠোর আবরণ বিদীর্ণ ক'রে গর্জে উঠেছিল বাঙালীর হাতের বোমা ও পিস্তল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তখন বাঙালী যুবকের বীরপনায় গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সারা ভারতবর্ষ বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, 'ভীরু' বাঙালীর এই জীবন-অভিযান। কত যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামের রোমান্সে ও উদ্দীপনায় মরণের নেশায় মেতে ওঠে—কত যুবক সে অনলে আত্মাহুতি দেয়; ফাঁসীতে, গুলিতে প্রাণ দেয়—দ্বীপান্তরে অন্ধকার কারাকক্ষে অসহনীয় নির্যাতনে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে; নিজেদের ত্যাগ, সাহস ও ঐকান্তিকতা দিয়েই দেশজননীর বন্ধন মোচন করবে এমন ছিল তাদের দুর্জয় সঙ্কল্প। যারা সেদিন সাম্রাজ্যবাদী দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে নির্বিচারে জীবন বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল—যারা মৃত্যুর গর্জন শুনেছিল সঙ্গীতের মতো, তাদেরই সাথের সাথী হওয়ার জন্য আমিও কিশোর বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। মরণ-অভিযানে বেরিয়েও মৃত্যুকে পাইনি। পথ চলতে চলতে পেয়েছি বিপ্লবের এক নূতন পরিচয়—জীবনের এক নূতন সাধনা—ক্রমবিকাশমান মানবতার এক অভিনব সুন্দর পরিকল্পনা।

স্বাদেশিকতার রঙীন আলোকে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সংগ্রাম-পথের সাধনায় কতকাল পরে সে-স্বাধীনতার স্পষ্ট সংজ্ঞা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গণ-বিপ্লব ও 'কমিউনিজ্‌ম্'-এর মহান উচ্চ আদর্শ আমাদের বিপ্লব প্রেরণাকে সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং বাস্তব সত্য করে তুলেছে। নব গণতন্ত্রের নূতন লক্ষ্যে গণ-মানবের মুক্তিসংগ্রামের 'দিন আগত ঐ'—অতীতে এমনটি হয়নি। কোটি কোটি দুর্গত জনসমষ্টিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করার অপূর্ব পরিকল্পনা পূর্বে

আমাদের চিন্তায় আসেনি। মরণ পথের ব্যর্থতা এনে দিয়েছে জীবন পথের নূতন সার্থকতা—বিপ্লবের নূতন রূপ—নূতনতর সংগ্রাম পদ্ধতি;—মরণের উচ্চতর প্রেরণা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বার বার দগ্ধ হয়েছি—অজ্ঞাতবাস, কারাবাস ও দ্বীপান্তর বাসের দীর্ঘ যাতনা সয়েছি, কিন্তু মরিনি। সাথীরা কেউ কেউ কেউ শত্রুর গুলিতে মরেছে—ফাঁসীতে মরেছে, কেউ বা জেলের নির্যাতনে মরেছে, আমি বেঁচে আছি। বেঁচে আছি বলেই অতীত জীবনের স্মৃতি এখানে একত্রে সমাবেশ করতে পারলাম। যুগযুগান্তর অতিক্রম করে এসে আমার এ-তুচ্ছ জীবন-কাহিনী ভাবী ঐতিহাসিকের কিছুটা কাজে লাগতে পারে। অন্ধকার যুগে দুঃখের নিশীথে যারা জীবনের আলো জ্বালিয়ে জনগণের মুক্তিপথের সন্ধান দিয়েছিল—যারা আত্ম-জীবন উৎসর্গ করে ভারতের জাতীয় জীবনের উষর ক্ষেত্রে নূতন আশার বারি সিঞ্চন করেছিল, যাদের কথা সবাই ভুলতে বসেছে, এই ছোট বইতে তাদেরই কথা আছে। তাদেরই জীবনাহুতিতে গড়া অতীত অগ্নিদিনের বিপ্লব সংগ্রামের কিছুটা আভাস দিতে চেষ্টা করেছি এখানে।

পঁয়ত্রিশ-ছ'ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে বিপ্লবের সঙ্কল্প ও প্রেরণা নিয়ে কর্মজীবনের আরম্ভ, আজো সে সঙ্কল্প ও প্রেরণা তেমনি বলবৎ আছে; কিন্তু বিপ্লবের লক্ষ্য ও নীতি-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে এর মধ্যে। ধন-ঐশ্বর্যলোভী প্রভুত্বকামী মধ্যবিত্তের বিপ্লব থেকে এবার দুর্গত-শোষিত-সর্বহারা জন-সমষ্টির বিপ্লব পথের সন্ধান পেয়েছি। তাই পৃথিবীর সকল দেশের বিপ্লবী জনসমষ্টির সহযোগে আমরাও এগিয়ে যাব নবগণতন্ত্রের মহান উচ্চতর বিপ্লবী সংগ্রাম সাধনায়।

টেরোরিজ্‌ম থেকে কমিউনিজ্‌ম্ বিংশ শতাব্দীর নূতন অবদান - ইতিহাসের স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত পরিণতি; রুশিয়ায় তা ঘটেছে—চীনে তা ঘটেছে—ভারতেও তারই সুশৃঙ্খল দ্রুত পুনরাবর্তন। এ অপরিহার্য—এ অবশ্যম্ভাবী।**

সতীশ পাকড়াশীর রচিত 'অগ্নিদিনের কথা" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (এপ্রিল ১৯৪৭) এর, লেখকের ভূমিকা। এই গ্রন্থটি বর্তমানে "অগ্নিযুগের কথা" নামে নবজাতক প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এই ছোট ভূমিকার মধ্যে সতীশ পাকড়াশী তার সমগ্র জীবন ও সংগ্রামের পর্যালোচনা অতি সুন্দরভাবে করেছেন। ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান বলে এই গ্রন্থে সংকলিত করলাম। বর্তমান নামকরণ আমার—শান্তিময় গুহ।

পুরানো দিনের কথা

বিদেশী ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসনের কঠোর নিষ্পেষণে। পরাধীনতার বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তখন নতুন খাতে ধীরে-মন্থরে প্রবাহিত হচ্ছিল; প্রকাশ্যভাবে সংগঠন ও আন্দোলনে বাধা পেয়ে অগ্রগামী যুবকেরা গোপনে বিপ্লবী সমিতিতে সংগঠিত হয়ে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। উৎপীড়নকারী বৃটিশ রাজকর্মচারী, সি· আই·ডি· পুলিশ ও বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের হত্যা করা ছিল তাদের চলতি কাজের 'প্রোগ্রাম'। ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্দীপনা জাগানোর জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য হাজার হাজার পুস্তিকা বিতরণ করে দেশের যুবশক্তিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হত; গোপন সংগঠনে যোগ দেওয়ার আহ্বান করা হত। খুব অল্প-সংখ্যক যুবকগণই দুর্ধর্ষ-শক্তি ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগুয়ান হওয়ার সাহস করত। দেশের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার অপরাধে কঠিন কারাদণ্ড ও উৎপীড়ন ভোগ করতে হত। ধৃত ব্যক্তির দূর সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজনদের উপরও পুলিশ নানারকম নির্যাতন চালাতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বিপ্লবীর বন্ধু হওয়াটাও বিপজ্জনক।

সর্বত্র ইংরাজ রাজ-কর্মচারী ও তাদের এদেশীয় অনুচরদের সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও শাসকগণ চারদিকে বিদ্রোহের বিভীষিকা দেখতেন। কঠোর নিষ্পেষণ ও উৎপীড়ন দ্বারাই জাতীয় মুক্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার অহমিকা বুদ্ধি নিয়েই তাঁরা কাজ করতেন। ইংরাজ সরকারের তখন প্রবল প্রতাপ! তাদের প্রবর্তিত দমন নীতিতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম জাগরণ স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ স্বভাবতঃই ভীতিগ্রস্ত ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বিমুখ হয়ে পড়েন।

এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও একদল যুবক গোপনে সংগঠন ও সন্ত্রাসমূলক কাজ চালিয়ে বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রেখে দেয়।

এমনই দুঃসময়ে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে গোপনে সংরক্ষিত অস্ত্র আনতে গিয়ে আমি ঢাকা জেলার একস্থানে গ্রেপ্তার হই। তিনটি '৪৫০ বোরের শক্তিশালি রিভলভার আমার পৌছিবার পূর্বেই পুলিশের হাতে পড়ে যায়। অত্যাচারী বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সংগৃহীত অস্ত্র শত্রুপক্ষের দখলে চলে যাওয়ায় আমি বড়ই ক্ষুন্ন হয়েছিলাম। হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি বেঁধে তারা আমাকে প্রথমে পুলিশ হাজতে, পরে জেলে নিয়ে গেল। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কোনই ত্রুটি হল না; কখনো ভীতি উৎপাদন করে, কখনো বা প্রলোভন দেখিয়ে কিশোরেব মন ভুলাবার সকল কৌশলই তাদের ব্যর্থ হয়ে যায়। উজ্জ্বল আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তরুণ যুবকের শক্ত মনকে কোন কিছুতেই টলানো সম্ভব হয় নি। অমানুষিক অসদ্ব্যবহার-অত্যাচারের ভিতর দিয়েই এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে ফিরে এলাম বাইরে,—জেলের নির্মম অভিজ্ঞতা ইস্পাতের মন তৈরী করে।

১৯১২ সাল। চল্লিশ বৎসর পূর্বের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দশকের কথা। যে মুক্তিসংগ্রামের সুরু শতাব্দীর প্রথম সময়ে নানা সঙ্কট-আবর্তের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে হতে আজ শতাব্দীর মধ্যভাগে সে সংগ্রাম ভারতের ব্যাপক গণসমষ্টির মুক্তি সংগ্রামে বিকশিত ও পুষ্ট হয়ে সাফল্যের পথে চলেছে। প্রথম যুগে আন্দোলনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য না থাকলেও ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদ করে দেশ স্বাধীন করতে হবে, এতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। বিপ্লব আন্দোলনের প্রসারতা ও ব্যাপকতা ছিল না, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রচণ্ড তীব্রতা দিয়ে সংগ্রামের চেতনা উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা হত। বিপ্লবের অগ্নিশিখায় মন আমার তখন উদ্বেলিত। জেল থেকে ফিরে এসে, বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের বিপ্লবী গোপন সংগঠনের কর্মী হয়ে কাজে লেগে গেলাম। দেশের জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা রোগ-বালাই দূর করার জন্য বিদেশী ইংরাজের অধীনতা পাশ থেকে ভারত স্বাধীন করতেই হবে। স্বদেশপ্রেমিক কত বীর সৈনিকের রক্তে দেশের মাটি রঞ্জিত হবে, মানবহিতৈষী, কত ত্যাগী সন্তানের জীবনদানে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে—শহীদের রক্তাপ্লুত মাটি থেকেই জেগে উঠবে শত সহস্র স্বাধীনতার যোদ্ধা।—এই বিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্পে উদ্দীপিত হয়েই আমরা তরুণ বাঙালী মধ্যবিত্তের দল সেদিন ইংরাজের দাসত্বের বিরুদ্ধে

অসম সাহসিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের গোপন সহানুভূতি আমাদের উৎসাহিত করত। সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী রাজা জমিদার ও খেতাবধারী মোসাহেব দলের ঘৃণা আমাদের ক্রুদ্ধমনে সংগ্রামের প্রতিহিংসা জাগাত।

এই বৎসর কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে ধুরন্ধর আই. বি. পুলিশ কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের গতিবিধির উপর তিনি নজর রাখতেন।

ময়মনসিংহের আই. বি. পুলিশ ইনস্পেক্টর বিপ্লবীদের নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হন, দিল্লীতে ভারতের ইংরাজ লাটসাহেবের উপর বোমা পড়ে—তিনি গুরুতর আহত হন। এতে সারা ভারতে সাড়া পড়ে। একদিকে সরকারী উৎপীড়নমূলক বিধি ব্যবস্থার কড়াকড়ি, অপরদিকে জনমনের উল্লাস, বিপ্লবীর শক্তিতে আশা ও বিশ্বাস। তারপরেই বের হল লাটসাহেবের স্বেচ্ছাচার শাসনের ফিরিস্তি সহ ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের আহ্বান সম্বলিত পুস্তিকা, এই পুস্তিকা উত্তর ভারতের নানাস্থানে হাজারে হাজারে গোপনে বিতরণ করা হল।

দেড়শ বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ও শাসনে আমাদের মধ্যযুগীয় কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অর্থনৈতিক ভিত্তিমূল ভেঙ্গে গেলেও পুরানো সমাজের জীর্ণ কাঠামোটা তখনো বজায় ছিল, আর তারই মধ্যে পল্লীসমাজ কায়ক্লেশে দিন গুজরান করত। আজকের দিনের মত তা একেবারে ধ্বসে পড়ে নাই। কৃষক সর্বস্বান্ত হয়েও পৈত্রিক ভিটা কামড়ে পড়েছিল। ধর্মবিশ্বাস এবং জমিদার ভীতি ও আনুগত্য তাদের নতুন পথের ও নতুন জীবনের কল্পনা ভুলিয়ে রেখেছিল। কৃষক শ্রেণীকে নিজস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার মত অবস্থা তখন ছিল না। গ্রাম্য কৃষক ও শিল্পী কারিগরদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে। কৃষক ও শিল্পীদের শোষণ করেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেদের প্রভাব প্রতিপত্তি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই কৃষক ও শিল্পীদের আয় যখন সাম্রাজ্যবাদী শোষণে বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন ছোট জমিদার, তালুকদার ও জোতদারদের আয়ের উপায় সঙ্কুচিত হওয়ায় তাদের ইংরাজ বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে, এই সব বঞ্চিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার থেকেই বিপ্লবীদলের কর্মীদের উদ্ভব হয়। তখনকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব, অসন্তোষ থেকে যে-বিপ্লব চিন্তাধারার উৎস সঞ্চারিত হয়, উহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুর্জোয়া বিপ্লব ছাড়া আর কি হতে পারে? মজুর আন্দোলন

তখনও দেখা দেয় নাই। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও শিল্প-কারখানার প্রসার হয় নাই কাজেই মজুরের সংখ্যাও ছিল কম। তাদের সংগঠিত ইউনিয়ন কয়েকটি মাত্র ছিল। ১৯০৮ সালে জাতীয় আন্দোলনের প্রিয়নেতা 'তিলক'কে গ্রেপ্তার করায় বোম্বাইয়ের সূতাকল মজুরেরা হাজারে হাজারে ধর্মঘট করে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে। উহাতে রুশের কমিউনিস্ট নেতা লেনিন ভারতের শ্রমিকের বিপ্লবীসম্ভাবনা বুঝলেও এ-দেশের তদানীন্তন বিপ্লবীরা মজুর শ্রেণীর সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যত বুঝেন নাই।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ভারতের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার অন্তরায়, সেই বিদেশী শোষণ ও শাসনের বাঁধা চূর্ণ করেই ভারতবর্ষকে শিল্পোৎপাদনে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, বিপ্লবীদের বক্তব্য ছিল তাই। শিল্পে অনুন্নত আমাদের এই ঔপনিবেশিক দেশে মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তখনকার দিনে খুব কঠিন ব্যাপার। ইউরোপের ধনতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে মজুর আন্দোলনের ও মার্কসবাদী চিন্তাধারা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতেই। এশিয়ার ঔপনিবেশিক দেশে উহা পরিস্ফুট হয় ১৯১৭ সালের রুশ নভেম্বর বিপ্লবের পরে। আমাদের দেশে তার পূর্বে ফরাসী দেশের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরানো মরচেপরা ভাবধারাই প্রগতিশীল চিন্তারূপে পরিগণিত হত। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে এ দেশের লোক অবহিত হয়নি।

১৯০৭-১৯০৮ সাল থেকে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামীদের কার্যকলাপ চলতে থাকে। ক্রমে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আন্দোলন প্রসারিত হয়। বোমা পিস্তলের আওয়াজ দেশের জনমনের জড়তা ভাঙ্গার কাজে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছিল। বিপ্লবীর বীরপনা, ত্যাগ, ফাঁসীতে বা গুলিতে জীবন দান জাতীয় চেতনার মরাগাঙ্গে বান এনে দিয়েছিল। পরদেশীর শাসনে দলিত, শোষণে ক্লিষ্ট, সকল গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছিল। কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত। যে কয়জন নেতা নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, সরকার তাঁদের স্থান করে দিয়েছিলেন জেলের মধ্যে। একমাত্র বিপ্লবীদলের কর্মীরাই বিজেতার স্বৈরাচারী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে সক্রিয় বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে আসেন। তাদেরই বোমার আওয়াজে স্বেচ্ছাচারী শাসকশক্তি ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে দেশের উৎপীড়িত জনসমষ্টি

নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাসবান হয়ে ওঠে। ইংরাজের বিরুদ্ধে 'ভীরু বাঙ্গালী' রুখে দাঁড়াতে পারে না বলেই ধারণা হয়ে গিয়েছিল। সেই ভ্রান্ত ধারণার মোহ কাটিল। বিপ্লবীদের বোমা-পিস্তলের বিকট শব্দে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এবং স্বদেশী মুক্তিকামী মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ফাটল ধরে যায়, শোষক-শোষিতের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। বিলাতী বুর্জোয়া কালচার দিয়ে বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের অন্যায় চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার মহান চেষ্টাই জোরদার হয়।

একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে জাতির অধঃপতনের মোড় ফেরাবার পুণ্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে গেছেন ক্ষুদীরাম, কানাইলাল, সত্যেন বসু, প্রফুল্ল চাকী, পুণার চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, দিল্লীর বসন্ত বিশ্বাস ও নাসিক-পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজের বিপ্লবী যুবকগণ। ভারত বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী রাজকর্মচারী স্যার কুর্জন ওয়াইলী ও তার ভাবতীয় সহচরকে লণ্ডনে গুলিতে হত্যা করে তরুণ যুবক মদনলাল ধিংড়া হাসিমুখে ফাঁসীতে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। আরো কতজন কারাগারে দ্বীপান্তরে লাঞ্ছিত জীবন কাটিয়েছেন।

১৯১৭ খৃঃ নভেম্বর বিপ্লবের কামান গর্জনে সমগ্র এশিয়া প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল নড়ে যায়। শোষিত ও ব্যথিত জনমনের যুগযুগান্তের সঞ্চিত আশা-আকাঙ্খা তীব্র আবেগে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে নতুন প্রাণ প্রবাহের প্রাচুর্যে। রুশ বিপ্লবের বিরাটত্ব, এর গভীরতা এবং বহুপ্রসারী ব্যাপকতার কাছে অতীতের সকল বিপ্লব ম্লান হয়ে গেল। রুশ বিপ্লবের মানবতার আদর্শ,কোটী-কোটী দুঃস্থ পীড়িত ও অবজ্ঞাত মানুষের মুক্তি ও চেতনার আদর্শ এত উজ্জল, এত মহান ও এত বাস্তব সত্য যে তাহার কাছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবের কল্পনা তিষ্ঠিতেই পারে না।

মজুর ও কৃষকের সংগঠন ও সংগ্রাম অতীত দিনের বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে স্থান পায় নাই। মধ্যবিত্তেদের সংগঠন তৈয়ারী করাও সম্ভব ছিল না। শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা ইংরাজ অধীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিলেন, কেহ কেহ অতি সংগোপনে বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ রাখতেন, কিন্তু আজকের দিনের মতো কেরাণী বা কর্মচারী সংগঠনের পরিকল্পনাও তদানীন্তন বিপ্লবীদের ছিল না। স্বাধীনতার উজ্জল আদর্শের রঙীন কল্পনায় বিভোর হয়ে দেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের পবিত্র সংকল্প নিয়ে আমরা মরণের পথে যাত্রা করেছিলাম। কি করে আমাদের স্বপ্নের সাধনা সফল পরিণতি লাভ করবে তার কোন বাস্তব

অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। যারা পরবর্তীকালেও অতীত বিপ্লবের চিন্তাধারা অবলম্বন করে থাকলেন। যারা নতুন যুগের নতুন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারলেন না, তাঁরাই প্রতিবিপ্লবী হয়ে দাঁড়ালেন। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ গ্রহণের কথা বলে যারা বিপ্লবী বলে পরিচিত হতে চান অথচ মার্কসবাদী-লেনিন-স্তালিনবাদী বিপ্লবের বিরুদ্ধাচারণ করেন তারা আসলে প্রতিবিপ্লবীর ভূমিকাই পালন করেন।

রাজ-জমিদারের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ সংশ্লিষ্ট একচেটীয়া পুঁজিপতি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তের সংগ্রাম আজকের দিনে বিপ্লবের সার্থকতা আনবে। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত ও সচেতন হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ বিপ্লব অভিযানের আগে যাবে। কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রমিক নেতৃত্বের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হবে শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে আগামী দিনে বিপ্লব সাফল্য মণ্ডিত করবে। চীন বিপ্লব সেই পথেই রক্তরেখা এঁকে দিয়েছে এশিয়ার সকল সাম্রাজ্যবাদ পীড়িত দেশের মানুষের কাছে।

মধ্যবিত্ত

শারদীয় সংকলন-১৯৫৯

সম্পাদক নির্মল ভট্টাচার্য।
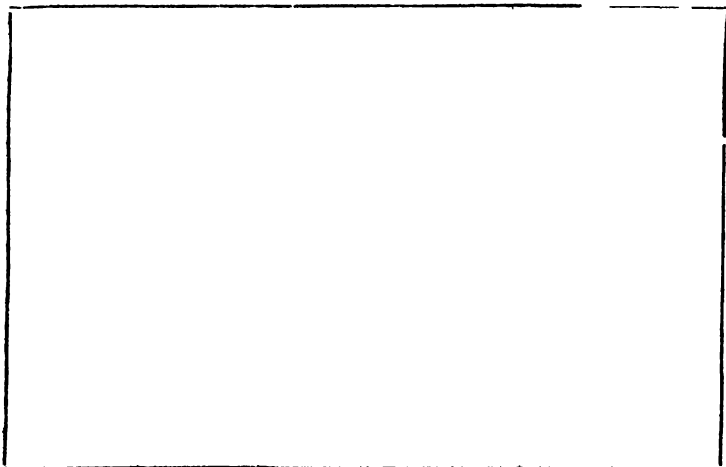
অনুশীলন সমিতি

ঘটনার স্রোত-প্রবাহে পুরাতন ভেসে যায় নূতন আসে। বিংশ শতাব্দীর সুরুতেই বাংলার শিক্ষিত সমাজ-মানসে এক নূতন চিন্তার উন্মেষ হয়, এক নূতন কর্মোদ্দীপনা আসে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলার দৃঢ় ইচ্ছার আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। দুর্ধর্ষ বিদেশী শাসনের ভয়ভীতি কেটে যায়। ইংরাজের আমদানী নূতন শিক্ষাদীক্ষার মোহও মুছে যায় শিক্ষিত জনের মন থেকে। ধর্ম-কর্ম, চিরাচরিত কৃষি-শিল্প শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার নিয়ে যারা দিনাতিপাত করছিলেন, বিদেশী শাসন ও শোষণে সর্বস্বান্ত হয়ে তারা জঙ্গী হয়ে উঠে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে—জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে।

এ-অবস্থায় ইংরাজ রাজের অধীনতার বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দীপ্ত সংগ্রাম-স্পৃহা নিয়ে ক্ষুদ্র একদল উদ্যোগী কর্মী সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার কাজে অবতীর্ণ হন।

১৮৯৭-৯৮ সালের কথা। কলকাতার শিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ কিছুসংখ্যক যুবক 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করে স্বাধীনতার কল্পনাকে কিভাবে রূপ দেওয়া যায় তারই চিন্তায় ও আলোচনায় ব্রতী হলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা নিয়ে ফিরে এসে যুবক ব্যারিষ্টার পি মিত্র (প্রমথ মিত্র) বিপ্লব-সমিতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন; তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'অনুশীলন সমিতি'তে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃষ্ট পন্থা ও কর্মনীতি নিয়ে নিয়মিত পড়াশুনা ও আলোচনা চলতে থাকে।

যুবক কবি রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল, সরলা দেবী, কয়েক জন শিক্ষক ও আরো অনেক সুশিক্ষিত কর্মানুরাগী ব্যক্তি এই আলোচনায় যোগ দিতেন। কলকাতার ভাল ভাল উদ্যোগী ছেলেরা ক্রমে ক্রমে এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ইংরাজের অধীনতা-নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে তদানীন্তন রাশিয়ার সশস্ত্র সংগ্রাম পদ্ধতি গ্রহণের ইন্ধন জুগিয়েছিলেন জাপানী প্রফেসার ওকাকুরা

অনুশীলন সমিতির গোপন বৈঠকে। যুবকদের বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া সংগঠিত করে তোলার কাজে পি মিত্র ও তাঁর সহকর্মীরা উৎসাহের সহিত কাজ করেন।

চারদিকের পরিবেশ সংগ্রামী কর্মপন্থার অনুকূল ছিল। লোকের মনে হতাশা—তাদের দুর্গতির কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে এমন আশা ও বিশ্বাস করার মত কিছু তারা পায় নাই। শিক্ষিতেরা ইংরাজ রাজকর্মচারীদের অপমান-উৎপীড়নে ম্রিয়মান। রাজনীতিক নেতারা আবেদনে নিবেদনের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নাই তখনো। দেশের মানুষ বিভ্রান্ত। কেউ বলেন ধর্মপথে মুক্তি আসবে, কেউ বা শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কথা বলেন, কংগ্রেস নেতারা বৎসরে একবার সম্মেলনে বসে বড় বড় চাকুরি ও লাট দরবারে আসন পাওয়ার দাবি করেন।

দাসত্ব পীড়নের হাত থেকে মুক্তিপথের জীয়নকাঠীটি কোথায়—কে তার সন্ধান দেবে।

এমনি সময় ভারতের রাজধানী কলকাতায় 'অনুশীলন সমিতি' একটা প্রকৃষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিমুখে যুবজনের চিত্ত আকৃষ্ট করে। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপনাপূর্ণ রাজনীতিক বক্তৃতা, ধর্মপ্রচারে বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য, হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের স্বাধীনতা ভাবোদ্দীপক কাব্য বাঙ্গালী জাতিকে আগেই অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। অনুশীলন সমিতি ঐ পটভূমিকায় দেশবাসীর কাছে একটা কর্মধারা নিয়ে দাঁড়ায়। আর ওরই ভিত্তিতে যুব সংগঠন আরম্ভ হয়।

ইংরাজের অধীনতার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'বুয়র'দের বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধের খবর এ দেশের মানুষকে কিছুটা উত্তপ্ত করে তোলে। চীনে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বক্সার বিদ্রোহ (**Boxers rebellion**) অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ হত্যা ও বিদেশী আধিপত্যের বিলোপ সাধনের চেষ্টার ফলে বাংলায় অনুরূপ কাজের আবেগ দেখা গিয়াছিল।

সমিতির নেতারা প্রথমে ব্যায়াম চর্চার সংগঠন তৈরী করার কাজে তৎপর হয়ে উঠেন। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব, আখড়া ও ব্যায়াম সমিতি খুলে লাঠি ও ছোরা খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, ড্রিল-প্যারেড ও অন্যান্য রকম ব্যায়াম ও অনুশীলনের দ্বারা যুবকদের আকৃষ্ট করে সংগঠিত করে তোলা সহজ হয়। অসংখ্য ছাত্র ও যুবক সক্রিয় হয়ে উঠল ব্যায়াম, লাঠী খেলা, ও সামরিক ধরনের প্যারেড শিক্ষায়। সমিতিতে রাজনীতিক শিক্ষা ও আলোচনার ব্যবস্থাও ছিল।

কলকাতার ও অন্যান্য জিলায় সমিতির শাখা বিস্তার হয়; শতশত যুবক জঙ্গী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সক্রিয় সংগঠন গড়ার কাজে সমিতির সংগঠন পরিচালক ও সামরিকভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী ও নেতা সৃষ্টি হয়—নিয়মানুবর্তিতাও (ডিসিপ্লিন) প্রবর্তিত হয় এই সংগঠনের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুশীলন" থেকে "অনুশীলন সমিতি" নাম গ্রহণ করা হয়। খেলা ও ব্যায়াম চর্চা থেকে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি অবধি ব্যাপক অর্থে এবং পুলিশের চোখের উপর বিপ্লবী সংগঠন করার কৌশল হিসাবেও এ-নামের প্রয়োগ তখন সঠিক বলে নেতারা স্থির করলেন।

প্রবীণরা তরুণদের সাহস, মনোবল, বলিষ্ঠ দেহ ও শারীরিক কর্ম-কুশলতা লাভের প্রচেষ্টাকে সোৎসাহে সমর্থন করেন। গোরা সৈন্যরা সেকালে পথে-ঘাটে বাঙ্গালীদের উপর অত্যাচার করত; খেলার মাঠে চৌরঙ্গীর পথে, ময়দানে ও রেল স্টেশনে গোরাদের বুটের আঘাত অনেককে সহ্য করতে হত।

মেয়েদের শ্লীলতাহানির কথা, রেলগাড়িতে গার্ড সাহেবদের নারী ধর্ষণ কাহিনী খবরের কাগজে পড়ে দেশের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত। শরীর চর্চায় উদ্দীপ্ত সাহসী ছেলের দল এর প্রতিবাদে এ অত্যাচারের প্রতিবিধান করবে অনেকে এ আশা করত। বস্তুত খেলার মাঠে গোরাদের হাতে মার খেয়ে এই ছেলেরা পালায় নাই। পাল্টা মারও দিয়াছে। উত্তর পশ্চিম দেশীয় টহলরাম গঙ্গারাম-নামে এক পালোয়ানের নেতৃত্বে আখড়ার কালো আদমীরা গোরাদের মাঝে মাঝে খুব মারধর করত। বিপদ বুঝে—গোরারা তখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলতে আরম্ভ করে। গোরাদের দৌরাত্ম্যও কমে। টহলরামের উপর পুলিশের খরদৃষ্টি পড়ায় তাকে পরে আর দেখা যায় নাই।

ইংরাজের ভয়ে ভীত বাংলার যুবচিত্ত এত উদ্বেল হয়ে উঠল কেন? মেকলের লিখিত "ভীরু বাঙালী" এমন দুর্ধর্ষ মারমুখো হয়ে উঠল কেন?—সাধারণ শিক্ষিত সমাজ সহজে চঞ্চল হয়ে উঠে নাই—এ আকস্মিক ঘটনাও নয়। বিলাতের আমদানী করা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস অর্থ ও রাষ্ট্রনীতি আর পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক কলকব্জা যানবাহন যন্ত্র শিল্প এদেশবাসীকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে ছিল কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করে শিক্ষিতেরা কেরানীগিরী ছাড়া আর কিছু পায় নাই—ইংরাজের স্বেচ্ছাচারিতায় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মর্যাদাবোধ ক্ষুন্ন হয়েছে—ইংরাজ বণিকের শোষণে ভারতের কৃষিশিল্প বিলুপ্ত হয়েছে, পরাধীনতার গ্লানি অভাব দারিদ্র্য বেকারী দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে; অপমান অত্যাচার ও

কঠোর নির্যাতনের দুঃসহ পীড়নে যুবকগণ সকল কর্মোদ্যোগ হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। এ দুরবস্থার মাঝে অল্পসংখ্যক কর্মীর মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—তারাই রুখে দাঁড়ায় গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে—নূতন জীবন গড়ার সোনালী স্বপ্নে।

ব্রিটিশের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের মন যখন বিষিয়ে উঠেছে একটা কিছু প্রতিকারের পথে অগ্রণী কর্মীরা যখন সংগঠিত হয়ে দাঁড়াতে সুরু করেছে তখনই ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগ করার নির্দেশ দিলেন। বাঙালী জাতির রাজনৈতিক চেতনায় ভীত হয়ে তিনি বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন ১৯০৫ সালে। রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালী জাতিকে দুর্বল করার জন্যেই লর্ড কার্জন এ চাল চালেন। বঙ্গভঙ্গের পর আগুনে ঘৃতাহুতির মত ব্রিটিশ বিদ্বেষের দাবানল ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলায়, এর প্রতিবাদে বিলাতী জিনিস বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের সংকল্প করলেন দেশের নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ। সরকারী শিক্ষা বর্জন করে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন চলল। সভা শোভাযাত্রা স্বদেশী সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম্ আওয়াজ চারিদিকে মুখরিত হয়ে উঠল। বিলাতী পণ্যদ্রব্য—কাপড় লবণ সিগারেট ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলার ও নষ্ট করে ফেলার হিড়িক পড়ে গেল। বহুদিনের জমাট বিক্ষোভ ফেটে পড়ল বাংলার সর্বত্র—শহরে ও গ্রামে।

"নগরে নগরে জ্বলবে আগুন
হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ"

সরকারী ধরপাকড়ও নূতন জীবন প্রবাহ রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টায় পর্যবসিত হয়। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এই স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ নেয় বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত অনুশীলন দল।

দলের নেতা ও কর্মীরা আন্দোলনের উৎসাহী যুবকদের রক্তাক্ত বিপ্লবী সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে অনুশীলনদলের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। নেতারা বুঝিয়ে দিতেন যে স্বদেশী আন্দোলনের ভয়ে ইংরাজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে না, দেশ স্বাধীন হবে না। সশস্ত্র শক্তির আঘাতে তাদের দেশ ছাড়া করতে হবে। অনুকূল আবহাওয়ায় এ-ভাবেই অনুশীলন সমিতি বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে প্রায় সারা বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় শত শত শাখা সমিতি গড়ে তোলে। অনেক যুবক ঘর-বাড়ি ছেড়ে স্বাধীনতার ডাকে চলে এলেন সমিতির

কর্মকেন্দ্রে ; জিলায় জিলায় দল গঠনের কাজে তারা উৎসাহের সহিত লেগে গেলেন। ইংরাজ শাসকের রক্তচক্ষু দেখে তারা দমে নাই—

"বেত মেরে কি আমায় মা ভুলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
যায় যেন জীবন চলে।"

দেশ মায়ের মুক্তি সংগ্রামে কবির ঐ গান তাদের মনোবল জুগিয়েছে।

১৯০৫ সালে তেজস্বী জননেতা সুবক্তা বিখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল পূর্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার অভিযানে ঢাকায় যান ; অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপনের জন্য দল নেতা পি মিত্রও একই সঙ্গে ঢাকায় যান। ঢাকার যুবনেতা পুলিন দাস পি মিত্রের নিকট বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়া অনুশীলন সমিতির কার্যভার গ্রহণ করেন। বিপিন পাল ও ঢাকার স্বদেশী আন্দোলনের বড নেতারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পি মিত্র দৃঢ়ভাবে বলেন, 'স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে ইংরেজ রাজত্ব ছেড়ে চলে যাবে না। তাদের মেরে তাড়াতে হবে। আমাদের অসি কোষমুক্ত হয়েছে আর পিছুলে চলবে না।'

পূর্ববঙ্গে সামিতি গঠনের ও পরিচালনের ভার পুলিন দাসের উপর প্রদত্ত হল। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের কার্যভার রইল সতীশ বসুর উপর।

অনুশীলন সমিতি প্রকাশ্য সংগঠন রূপে গডে উঠে, কিন্তু এর লক্ষ্য ও কর্ম-কৌশল গোপন রাখা হয়। বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করে দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই এ সমিতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সমিতির লাঠি ও ছুরি খেলায়। লাঠি খেলা আসলে তরবারী চালনা শিক্ষা ; বড় লাঠি দিয়া বেয়নেট যুক্ত রাইফ্‌ল্ বন্দুক চালনা শিক্ষা দেওয়া হত। বড লাঠি ঘাড়ে নিয়া প্যারেড কুচ্‌কাওয়াজ ঢাকা অনুশীলন কেন্দ্রে নিয়মিত চলত।

মাঝে মাঝে কৃত্রিম যুদ্ধের ম্যানুভার দ্বারা রণকৌশল শিক্ষা দেওয়া হত। নৌকাচালান, গাড়ি চালান, ঘোড়দৌড়, দড়ি বেয়ে গাছে উঠা, অকস্মাৎ আঘাত দিয়ে সরে পড়া (**Hit & run**), ইত্যাদি বিবিধ কৌশল গেরিলা বিদ্রোহের সময়ে প্রয়োজন হবে বলে অনুভূত হয়, জাপানী 'যুযুৎসুর' প্যাচে শত্রুকে ঘায়েল করার শিক্ষা ও বক্সিং (**Boxing**) শিক্ষার উপযোগী শিক্ষক (ট্রেইনার) সংগ্রহ করা হয়।

চীনে বকসারদের বিদ্রোহের কথা জেনে এখানেও 'বক্সিং' শিক্ষার আগ্রহ দেখা দেয়। প্রথমে সরলা দেবীর বাড়িতে গোপনে 'বক্সিং' শেখান হত। গোরা গুণ্ডাদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যায়াম চর্চার দল গঠনের কথা প্রকাশ্যে প্রচার করা হয়। বঙ্গভঙ্গের সময় সরকারী উসকানীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। পূর্ববঙ্গে ঐ দাঙ্গায় আত্মরক্ষার জন্যও লাঠি-ছুরি খেলার কথা প্রচার করা হত। কিন্তু দলের নেতা ও বিশ্বস্ত-কর্মীরা জানতেন অনুশীলন দল বিপ্লবী দল। সশস্ত্র গেরিলা বিদ্রোহ সংগঠিত করার জন্য দেশের যুবশক্তিকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ও অস্ত্র সংগ্রহ করে বিদেশী শাসনের অবসান করাই এর আসল উদ্দেশ্য। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' এই ছিল তখনকার দিনের সোনার স্বপ্ন। সেই 'স্বপ্ন' বাস্তবে প্রতিফলিত করার জন্য কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম, কত আত্মদান প্রয়োজন হয়েছে। আর পুলিশী নির্যাতনে, কারান্তরালের নির্মম পীড়নে ফাঁসিতে গুলিতে কত জীবন বলি প্রদত্ত হয়েছে। যুবকগণ কিন্তু তাতে এতটুকু দমে নাই বরং উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত বিপ্লব দলের কাজ করতেন।

মর্তাজা নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় লাঠিয়ালের নিকট পুলিন দাস খুব ভাল লাঠিখেলা শেখেন। পুলিন দাসের অধীনায়কতায় পূর্ববঙ্গে অনুশীলন দল দিনে দিনে বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। জিলায় জিলায় সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়—ছয় শতাধিক শাখা স্থাপিত হয়, লাঠি ও ছুরি খেলা, ড্রিল কুচ-কাওয়াজ কৃত্রিম যুদ্ধ নিরন্তর চলতে থাকে। গেরিলা যুদ্ধ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা জানার ও বুঝার আগ্রহে সখারামের—'গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী', বর্তমান রণনীতি, ইটালী, আয়র্ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার গুপ্তসমিতি ও সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস পড়ার ঝোঁক দেখা দেয়।

জনসেবার কাজেও এই সমিতির ভলান্টিয়ারগণ এগিয়ে আসেন। জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে দল পুষ্ট ও জোরদার হয়ে উঠে। সামরিক নিয়মানুবর্তিতা (ডিসিপ্লিন) প্রথম থেকেই প্রবর্তিত হয়েছিল। সমগ্র পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে পুলিন দাসের পরিচালনায় এককেন্দ্রীক মিলিটারী দলের মত সুসংহত ও সুপরিচালিত এক যুবক বাহিনী সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ করার দৃঢ় সংকল্পে। এই যুবসংগঠন ভেঙে দেওয়ার কথা বলতে যেয়ে বিলাতের পার্লামেন্টে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, 'পূর্ববাংলায় পুলিন দাস নামক এক

ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে পনেরো হাজার যুবকের এক উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী দল গড়ে উঠেছে, একে সংযত করা দরকার।'

উনবিংশ শতকের শেষভাগে ভারতের রাজধানী কলকাতাতেই প্রথমে বিপ্লবী চিন্তার উন্মেষ হয় এবং পরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে অনুশীলন সমিতি হয়। নবভাবে উদ্বুদ্ধ উদ্যোগী প্রগতিশীল কর্মীরাই প্রথমে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন।

(এর পূর্বে মহারাষ্ট্রে পুণায় বিপ্লবী দল গঠিত হয়েছিল; মহারাষ্ট্র থেকে যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় অনুরূপ ভাবাপন্ন যুবকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।)

বারীন ঘোষ, যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ভুপেন দত্ত প্রমুখ অগ্রণী কর্মীরা সেদিনে বিপ্লবী নেতা পি মিত্রের সহযোগে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষও বরোদা থেকে এসে পি মিত্রের সঙ্গে সংযোগ করেন। পরে তাঁরা পৃথক বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেন। শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে ইংরাজের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ইংরাজের দাসত্বের বিরুদ্ধে অনুশীলন সমিতিই সূর্যালোকের মতো নূতন মুক্ত জীবনের বাণী নিয়ে বাংলার যৌবন জীবনের মোড ঘুরিয়ে দেয়,—ভীরুতা, স্বার্থপরতা ও নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, সাহস ও মনোবল জাগিয়ে তোলে। মুক্তিসংগ্রাম পথে ত্যাগের আদর্শ সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করে। জন-চেতনা ও জন-সংগঠনের প্রাণ চঞ্চল উদ্যোগ নিয়ে দাঁড়ায় দেশবাসীর সম্মুখে। জাতীয় জাগরণের গোড়ায় সংগঠিত বিপ্লবী দল হিসাবে অনুশীলন সমিতির প্রধান ভূমিকা থাকলেও দেশে একটি বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসাবে দাঁড়ায় নাই।

স্বদেশী আন্দোলনে তৎপর অগ্রগামী জাতীয় দলের ও সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন যুবক দলের পারস্পরিক সহযোগিতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ তেজস্বী নেতৃবৃন্দের সাহায্য ও উদ্দীপনা সর্বোপরি ছাত্র যুবক ও সাধারণ লোকের নূতন আশা আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বসিত আবেগ, অনুশীলন দলের কার্যধারাকে পুষ্ট করেছে, লক্ষ্যপথের রেখাটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তোলার সহায়ক হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের দারুণ আঘাতে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে যে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্য অভিমান গর্জে উঠেছিল তা থেকে উজ্জীবিত হয় ও সৃষ্টি হয় বাংলায় জাতীয় সাহিত্য ও সঙ্গীত, জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসেরও যথাযথ মূল্যায়ণ হতে থাকে এ সময় থেকে। রমেশ দত্ত ও বঙ্কিম চন্দ্রের জাতীয়

ভাবোদ্দীপক উপন্যাস, হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের কবিতা, বিবেকানন্দের লেখা ও বক্তৃতা, রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা, সখারামের 'দেশের কথা' স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করে। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা', ডাঃ ভূপেন দত্ত ও অন্যান্য বিপ্লবীদের পরিচালিত 'যুগান্তর' পত্রিকা দেশের সাধারণ লোকের কাছে ও কর্মীদের কাছে বিদ্রোহাত্মক কাজের উদ্দীপনা নিয়ে আসে। 'আনন্দমঠের' সংগ্রামী সন্তান দলের অনুপ্রেরণায় যুবচিত্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ত।

মহারাষ্ট্র ও শিবাজীর সংগ্রামী ইতিহাস, পাঞ্জাবের বীর রণজিৎ সিংহের যুদ্ধ, রাজপুতের বীরত্ব 'সিপাহীবিদ্রোহের' কথা—এসকল স্বদেশের সংগ্রাম ইতিহাসের মতো বিদেশের সংগ্রাম কাহিনীও বিপ্লবীদের প্রাণস্পর্শ করেছে। ফরাসী বিপ্লব, ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম (ম্যাটসিনি ও গারিবল্ডীর কথা), জার সম্রাটের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব দলের রোমহর্ষক কার্যকলাপ বাংলার বিপ্লবী যুবকগণ আগ্রহ সহকারে পড়তেন এবং জীবন দিয়েও কাজ করবার জন্য আকুল হয়ে উঠতেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রুশ জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভে সমগ্র এশিয়াবাসী গৌরব বোধ করে। 'পাশ্চাত্ত্য দানবীয় শক্তির' পরাজয় প্রাচ্য এশিয়ার সকল দেশের লোককেই আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করে—স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্ভাব্য সাফল্যের আশায় সংগ্রামের উদ্যোগ নেওয়ার মনোবল যোগায় কর্মীমনে। জাপানের যুদ্ধজয়, বাংলার 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' আন্দোলন জোরদার করে—জয়ের আশায় কর্মীদের উদ্যোগ তীব্রতর করে তোলে। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে পড়েন।

১৯০৫ সালে বাংলায় নবজাগরণ আসে। বিদেশীর আনুগত্য ছেড়ে স্বদেশবাসীর উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়ল; সুরু হল স্বদেশী আন্দোলন, অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে ঘৃণা ও রোষ উথলে উঠে বিদেশের সবকিছু বর্জনের সংকল্পে—বিলাতী শাসনেরও অবসানকল্পে। ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য সকল জননেতাদের শোভাযাত্রায় পুলিশ লাঠি চার্জ করে অনেককে আহত করে। বাংলা দেশের ও ভারতের বরেণ্য নেতা সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলেন এবং শাস্তি পেলেন।

এই পুলিশী আক্রমণের ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অসন্তোষ ছড়িয়ে

পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের পথ ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের চিন্তা অনিবার্য হয়ে উঠে।

১৯০৬ সালের শেষভাগে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে বিদেশের অধীনতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন নেতৃবৃন্দ। সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর "স্বরাজ" দাবিতে সারা ভারতে নূতন আশার আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠল; "দিকে দিকে নূতন আজ ঘোষিয়াছে অভিযান"। জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন ক্ষেত্রে মাতৃপূজার অনুষ্ঠান হয়, আনন্দমঠের 'দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী' দেশজননীর বিপ্লবী সন্তানরা অসুর দলনের অনুপ্রেরণা নেওয়ার জন্যই এ পূজার আয়োজন। তিলক ও মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী নেতারা এতে পৌরহিত্য করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত বীরত্ব ব্যঞ্জক "শিবাজী" কবিতা দিয়ে মাতৃপূজার উদ্বোধন করেন। সে কি উন্মাদনা—নব জাতীয়তাবোধের কি তীব্র আনন্দোচ্ছ্বাস। দীর্ঘকালের পরাধীনতার শৃঙ্খল এবার ছিন্ন হবেই।

প্রবীণ জাতীয়তাবাদীরা নবীনের এ উৎসবে নির্লিপ্ত ছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় বিপ্লবী কর্মী ও নেতারা বাংলা দেশের বিভিন্ন জিলা থেকে এসে মিলিত হলেন এক গোপন সভায়। সেই ছিল বিপ্লবী দলের প্রথম সম্মেলন। প্রমথ মিত্রের সভাপতিত্বে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে বসে বিপ্লব সংগঠন ও কার্যধারা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রকাশ্য জাতীয় মহাসম্মেলনের অন্তরালে অপ্রকাশ্য জাতীয় বিপ্লব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে। সভাপতি পি. মিত্র বৈপ্লবিক কর্মের সংগঠন, প্রচার, সামরিক শিক্ষা, সামরিক ডিসিপ্লিন ও গোপনীয়তা রক্ষার কথা বলেন। কে কোন জিলার কার্যভার নিবেন তাও স্থির হয়। পুলিন দাস নিজেই ঢাকা জিলার অনুশীলন সমিতির পরিচালনভার নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সতীশ বসুকে কলকাতার কার্যভার দেওয়া হয়। "যুগান্তর" পত্রিকা চালানোর সাহায্য করার জন্য পি. মিত্র সকলকে অনুরোধ করেন।

অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, ভুপেন দত্ত (ডাঃ), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিন দাস, সতীশ বসু ও আরো অনেক জিলার প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত হন। স্বদেশী আন্দোলনের পর সশস্ত্র সংগ্রাম আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার যুগসন্ধিক্ষণে এই বিপ্লবী সম্মেলন হয়ে গেল। ১৯০৭ সাল থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ধীরে ধীরে সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে পদক্ষেপ করে। সরকারী দমন নীতিই এপথে চলার অনুকূল অবস্থা তৈরী করে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ

ধীরে ধীরে জাতীয় সংগ্রামের রূপ নেয়। গুপ্ত সমিতির সংগঠন ও কাজকর্ম চালানোর জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করার চেষ্টায় অনন্যোপায় হয়ে বলপূর্বক অর্থ কেড়ে নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হল। বন্দুক পিস্তল রিভলভার কেনার টাকা চাই, বিপ্লবী সংগঠন বিস্তারের জন্য যাতায়াত খরচ চাই, ঘরবাড়ি ত্যাগী সর্বক্ষণের কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা চাই,—ধনীরা বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যয় বহন করতে নারাজ অথচ উচ্চ রাজকর্মচারীদের অভ্যর্থনায় লাট বেলাটের সম্বর্ধনায় মোটা টাকা তারা ব্যয় করেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির আলোচনায় স্থির হয় ডাকাতি করে অত্যাচারী সুদখোর মহাজনদের টাকা কেড়ে নিতে হবে-পোষ্টঅফিস বা ট্রেজারির টাকা যাতায়াতের পথে ছিনিয়ে নেওয়ার কল্পনাও তারা করেন। ১৯০৬ সাল থেকেই আরম্ভ হয় বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করে বিপ্লবী কাজ করার প্রচেষ্টা। প্রথমে এ-কাজে কর্মীরা পটু ছিলেন না বলে প্রায়ই ব্যর্থ হয়ে যেত। পরে তাদের দক্ষতা বাড়ে।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারীতে অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীর পুলিন বিহারী দাসের জন্মোৎসব সভায় সভাপতি বারীন ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, 'বাংলা তথা ভারতের প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল পুলিন দাস ছিলেন বিপ্লবী বাংলার দামাল ছেলে। সিস্টার নিবেদিতা ও সরলা দেবীর কাছে পত্র দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বাংলার প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠন করার জন্য বরদার গায়কোয়াড়ের শরীর রক্ষী বাহিনীর নেতা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় পাঠালেন ১৯০৩ সালে। পি· মিত্র মহাশয়কে বিপ্লবী বাংলার প্রথম প্রেসিডেণ্ট করে আরম্ভ হল সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির কাল। মিত্র মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত ছিলেন পুলিন ও সতীশ—অনুশীলন সমিতির দুই কর্ণধার। দুজনের কর্মক্ষেত্র বণ্টন করে সতীশকে দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গের গঠনের ভার। আর পুলিনকে দেওয়া হল পূর্ববঙ্গে ঢাকা অনুশীলন সমিতির কর্ণধার করে। এই দুই অপূর্ব সংগঠক অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বাংলা-দেশ ছেয়ে ফেললেন অসংখ্য ব্যায়ামশালায় ও লাঠি খেলার আখড়ায়। পুলিন বিহারীর ন্যায় লৌহ ধাতুতে গড়া মানুষ দিয়ে বিপ্লবী বাংলা তৈরী হয়েছিল যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে কানাই, সত্যেন, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, রাসবিহারী, মাষ্টারদা ও সুভাষ বসু।'

মানুষের জীবন-সংগ্রামের যাত্রা পথে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সূচনাতেও তার ব্যতিক্রম হয়

নাই। বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করে সারা বাংলা দেশে যে প্রচণ্ড আন্দোলন হয় তাতে আপসপন্থী বড়বড় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সক্রিয় প্রতিরোধপন্থী নূতন কংগ্রেস নেতাদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠে। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মী দক্ষিণপন্থী নেতারা ইংরেজের নিকট থেকে শাসন সংস্কার পেলেই সন্তুষ্ট, অন্যদিকে বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য হল দেশের 'স্বাধীনতা'। নরমপন্থীরা আবেদন নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক পথে আর চরমপন্থীরা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের পথে নিজেদের শক্তিদ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করতে চান। বিপ্লবী দলের নেতারা চাইতেন সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ব্রিটিশ রাজত্বের ধ্বংসসাধন ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন।

১৯০৬ সালে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী ও চরমপন্থী রাজনৈতিক দলের বিরোধ চরমে উঠে—

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে দুইদল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যায়।

দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবর্গ রইলেন ব্রিটিশের রাজছত্রতলে, বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা গেলেন জেলে—নির্বাসনে। ব্রিটিশ সরকারের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ—সরকারী নিষ্পেষণ নীতিতে ও পুলিশের কঠোর নির্যাতনে সকল প্রকাশ্য আন্দোলন ম্লান হয়ে পড়ে। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কাজই শুধু চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। ফাঁসীতে গুলীতে আত্মজীবন উৎসর্গ করে, দ্বীপান্তরে—কারাগারে অমানুষিক নিপীড়ন ভোগ করে দেশের স্বাধীনতা কার্য দ্বারা তারা দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করে; এবং তাঁরাই একমাত্র আত্মত্যাগী সৎসাহসী কর্মীরূপে সর্বসাধারণের অন্তরে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। ১৯০৬-৭ সালের পর থেকে ১৯১৮ সাল অবধি বিপ্লবপন্থী গুপ্ত সমিতির রক্তাক্ত সংগ্রাম আন্দোলনই বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চে একমাত্র আন্দোলন ছিল বলা যায়। ১৯২০-২১ সাল থেকে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক জনতার সাড়া জাগায়। এর পূর্ব অবধি অনুশীলন সমিতি বাংলায়, আসামে ও সারা উত্তর ভারতে সংগঠন বিস্তার করে ইংরাজের অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সে কথা পরে—।

ইংরাজের অধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের রক্তাক্ত ইতিহাস অহিংস প্রেমিক গান্ধীবাদী-দের ইতিহাসে মর্যাদার আসন নাও পেতে পারে—কংগ্রেস কর্তৃপক্ষেরও স্বার্থের

পরিপন্থী হতে পারে এইসব কার্যকলাপ, কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এ রক্তরাঙা সংগ্রামী অধ্যায় আমাদের ইতিহাস প্রণেতাদেরও তেমন নজরে পড়ে নাই। ঐতিহাসিকের পক্ষে এর মূল্যায়ন করা কি এতই কঠিন ছিল ?

অনুশীলন

৩য় বর্ষ শারদীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

সম্পাদক : গোপাল ঘোষ ও শ্যামসুন্দর দে।
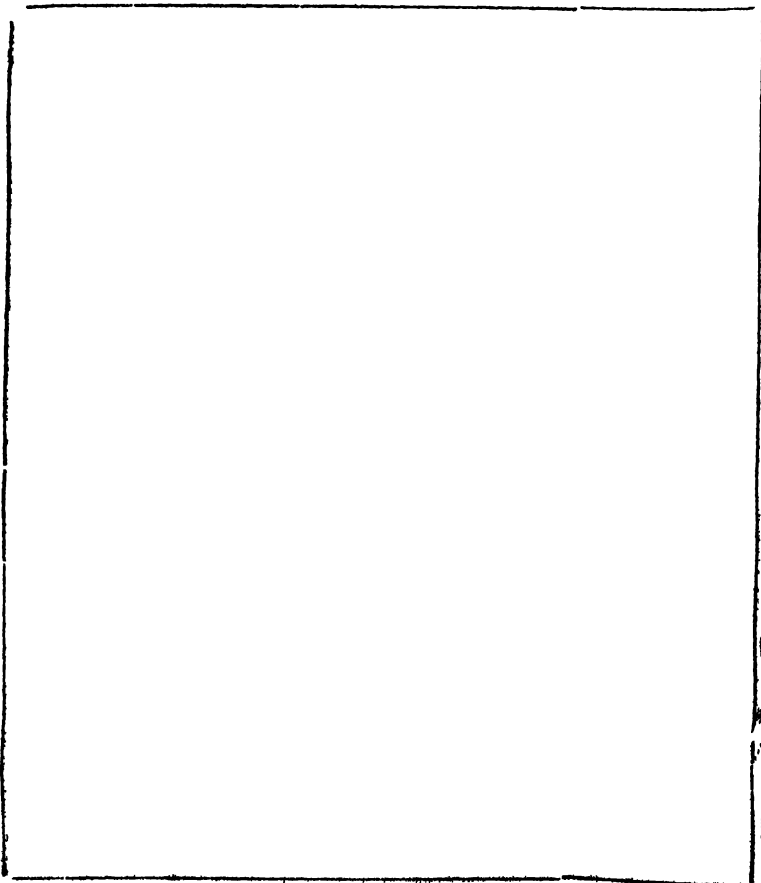
বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

ইংরাজ রাজত্বে বাংলাদেশ শিক্ষায় ও রাজনৈতিক চেতনায় অনেকদূর এগিয়ে যায়। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী ও বাংলা দেশের অগ্রগতি রোধ করার জন্য ১৯০৫ সালে ইংরাজ সরকার বাংলা দেশ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় দ্বিধা বিভক্ত করে দেয়। তারই প্রতিবাদে 'স্বদেশী আন্দোলন' অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছিল সারা বাংলায়। ইংরাজের অধীনতার বিরুদ্ধে সে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে ১৯০৬-৭ সালে। বাংলা দেশের সাহসী দেশহিতৈষী কর্মী যুবকগণ এ জাতীয় স্পন্দনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে,—কঠোর আঘাতে বিদেশী অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তিকে ঘায়েল করতে না পারলে শুধু স্বদেশী আন্দোলনে কিছুই হবে না, কর্মোদ্যোগী যুব চিত্তে এ ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। পিস্তল-রিভলভারের গুলিতে ও বোমার আঘাতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যুব সংগঠন তৈরী হল। স্বাধীনতা অর্জনের বিপ্লবী সংগঠন গোপনে দানা বেঁধে উঠল। রাষ্ট্রবিপ্লব না হলে ভারতের ভবিষ্যৎ নাই,—রক্তের নেশায় মেতে উঠল একদল নির্ভীক সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক। তদানীন্তন রুশের বিপ্লবী সংগ্রাম, আয়ার্ল্যাণ্ডের 'সিনফিন' ও ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডীর 'কারবনারি' দলের সংগ্রাম তাদের অনুপ্রাণিত করল। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ব্যারিষ্টার পি. মিত্র প্রমুখ নেতৃবর্গ তাদের পথের লক্ষ্য সুস্পষ্ট করে তোলেন। একদিকে উচ্চ রাজকর্মচারী হত্যা, ইংরাজ সরকারের সহায় পুলিশ কর্মচারীদের হত্যা, আর একদিকে বিদ্রোহাত্মক সাহিত্য রচনা ও পুস্তিকা বিতরণ করে জনমনে বিদ্রোহের উদ্দীপনা সঞ্চার, বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে বিপ্লবীরা আত্মনিয়োগ করলেন। বিপ্লবীদের দুর্ধর্ষ সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ সারাভারতে নূতন জাতীয় স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, জনগণের রুদ্ধ বিক্ষোভ থেকে তাদের কাজের প্রতি সাহায্য ও সমর্থনের উদ্রেক করে। ইংরাজ স্বৈরাচারী

শাসকগণও গুলিতে, ফাঁসীতে ও তীব্র নির্যাতনে দেশহিতৈষী বিপ্লবী যুবকদের হত্যা করতে থাকে—শত সহস্র ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, দ্বীপান্তরে নির্বাসন দেয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার তো সেদিন মোটেই ছিল না। কিন্তু অমানুষিক অত্যাচারেও সংগ্রামী আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হল না। কর্মীদের সংগ্রাম বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। দলের বিস্তার হতে লাগল—জনসমর্থনও বৃদ্ধি পেল, বিদেশের সহানুভূতি পেয়ে ভারতের আন্দোলন জোরদার হল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিতে ইংরাজ সাম্রাজ্য-বাদীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। দমন-পীড়ন তীব্রতর করেও যখন বিপ্লব আন্দোলনের দুর্বার গতি রোধ করা গেল না, তখন শাসন-সংস্কার ঘোষণা করে তারা ভারতবাসীকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। মুক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ শৃঙ্খলিত মানুষকে কোন কিছুতেই বাগ মানানো যায় না। পথের শেষ অবধি না পৌঁছে এর বিরাম নেই। মুষ্টিমেয় যুবক শতাব্দীর প্রথমদিকে যে সংগ্রাম সুরু করেছিলেন, শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তা বিরাট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জীবন দিয়ে তাঁরা জাতির জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। শাসন অত্যাচারে মানুষের উদগ্র মুক্তিপ্রেরণা আরো উদ্দীপিত হয়। মানুষের আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা কখনো কোন যুগে ঠেকিয়ে রাখা যায় নি, জাতির উদ্ভিন্নযৌবন সংগ্রামী আন্দো-লনের পথশেষে জয় নিয়ে আসবে—এ-বিশ্বাসে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সংগ্রামী জনগণ ব্যাপক সংগঠন গড়ে তুললেন। শাসন সংস্কার দিয়ে জনগণকে তুষ্ট করার প্রয়াস ব্যর্থ হলে ইংরাজ সরকার কঠোর দমন নীতির চাকায় সকলকে পিষ্ট করতে লাগল। ধরপাকড়, খানাতল্লাশ, পুলিশী নির্যাতন, গুপ্তচর লাগিয়ে প্রগতিশীল লোকদের হয়রানি, চাকুরীজীবীদের চাকুরী খতম, ছাত্রদের স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়ন ইত্যাদি সুরু করে দিল।

প্রতি জিলায়-শহরে-গ্রামে পুলিশী জুলুম চলল, গৃহস্থের বাড়িতে ছাত্রাবাসে হোষ্টেলে-মেসে-ক্লাবে-পাঠাগারে-ব্যায়ামাগারে-স্কুলে-কলেজে পুলিশী হানা লেগেই ছিল। বছরের পর বছর মানুষের হয়রানির আর সীমা ছিল না।

বিপ্লবী দলের কাজে কিন্তু জনসমর্থন বেড়েই চলল—গোপনে কর্মীদের আশ্রয় দেওয়া, তাদের অস্ত্র ও কাগজপত্র রক্ষা করা, বা স্থানান্তরে বহন করে নিয়ে যাওয়া, বিপদসঙ্কুল স্থানে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, সাধারণলোক খুব তৎপরতার সহিত পুলিশের চোখের উপর দিয়ে এ সকল কাজে বিপ্লবীদের সহায়তা করতেন। মেয়েরাও পিছনে পড়ে থাকেন নাই। বিপদের আশঙ্কা

থাকা সত্ত্বেও ভদ্র পরিবারের বউরা গুপ্তচরের দৃষ্টি এড়িয়ে শাড়ীর নীচে রিভলভার, কখনো বা বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বহন করে নিয়ে গেছেন। বাড়িতে পুলিশ তল্লাশ করতে এলে কোন কোন ভদ্রকুলবধূ পুলিশ-সার্জেন্টের সম্মুখ দিয়েই পিস্তল নিয়ে নির্ভীক চিত্তে বেরিয়ে গেছেন, কোনও বা মা-দিদি-বৌদিরা ফেরারী বিপ্লবীকে কৌশলে ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন। সাহসী ও চৌকশ লোক না হলে এমন কাজ করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে সহায়তা করতে পেরে মেয়েরা গর্ব বোধ করতেন। স্কুল কলেজের মেয়েরা বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে অনেক বীরপণা দেখিয়েছেন।

শতাব্দীর প্রথম দুইদশকে আর কোন রকম আন্দোলন দেশে ছিল না, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল। একটি পুলিশের গুপ্তচর গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা গেলে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'একটি কুকুর মারা গেল।' শ্রোতারা হাততালি দিতেন। কংগ্রেস নেতারা বৎসরে একবার বড়দিনের ছুটিতে মিলিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ জানাতেন। এর বেশী আর আন্দোলন ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদলই ছিল বামপন্থী জাতীয় সংগ্রামের প্রতীক। স্বাধীনতার পথে তারাই প্রথম পদক্ষেপ করেন। তাদের কাজের প্রতি অকুণ্ঠ জন সমর্থন ছিল। শোভাবাজারের মোড়ে ট্রাম গাড়ি থেকে নামার সময় গোয়েন্দা পুলিশ ইনস্পেক্টার নৃপেন ঘোষকে গুলি করে বিপ্লবী যুবকগণ চলে গেলেন শত শত লোকের চোখের উপর দিয়ে। তখনই পুলিশ ছুটে গিয়ে এক গলি থেকে কলেজের ছাত্র নির্মল রায়কে গ্রেপ্তার করে আনে। কেউই তাকে গুলি করতে দেখেছে বলে সনাক্ত করেনি। নির্মল পুলিশের মার খেয়েই গেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা টিকল না। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে কলেজ স্ট্রীটে পুলিশ কর্মচারী মধুসূদন ভট্টাচার্যকে কয়েকজন গুলিতে নিহত করে বেলা ১০-টায় অফিসের সময়ে দৃপ্ত বেগে চলে গেছেন, কেউই তাদের গতি রোধ করেনি। সন্ধ্যাকালে গ্যাসের আলোকোজ্জ্বল কলেজস্কোয়ারে যুবকদের অনুসরণকারী পুলিশের গুপ্তচর হরিপদ দে-কে তারা গুলি করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সান্ধ্য ভ্রমণকারীদের কলেজস্কোয়ার জনশূন্য হয়ে যায়, পুলিশের মৃত দেহটিই শুধু পড়ে থাকে।

গোয়ালন্দে রেল-ষ্টীমার স্টেশনে সকাল বেলা বহু লোকের ভীড়ের মধ্যে ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট 'এ্যালেন' সাহেবকে গুলি করে কয়েকটি যুবক

রিভলভার উচিয়ে চলে গেলেন, পুলিশেরাও তাদের অনুসরণ করতে সাহস পায় নি। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট 'পডী সাহেবকেও' কারিগরী বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীতে এমনি করেই গুলি করে মারা হয়। পুলিশ পরে একটি শিশুকে ডেকে নিয়ে আদর করে জিজ্ঞাসা করায় শিশুটি আধ-আধ বুলিতে বলে, 'বিমলদা সাহেবকে মেরে দৌড়ে চলে গেছে।' পরপর দু'জন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মেদিনীপুরেই প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়।

চট্টগ্রাম সাহেবদের ক্লাবে বোমা মেরে সকলে সরে পড়ার সময় কলেজের ছাত্রী প্রীতিলতা মারা যান। আর কেউই ধরা পড়ে নাই। আই. বি. পুলিশের কুখ্যাত সুপারিণ্টেণ্ড বসন্ত চাটার্জীকে ঢাকায় গুলি করা হয়, সুপার সাহেব জলে ঝাঁপ দিয়ে বেঁচে গেল—তার দেহরক্ষীটি মারা গেল। পরে কলকাতায় তাকে লক্ষ্য করে আবার বোমা মারা হয়। সেবারেও চ্যাটার্জী সাহেব রক্ষা পায়। অতঃপর তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে বাংলার সর্বত্র জোর গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন এবং আই. বি. অফিসে এনে বিপ্লবী সন্দেহে বহুলোকের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে।

অতঃপর তিনি হরিশ মুখার্জী ষ্ট্রীট পুলিশ ব্যারাকের সুরক্ষিত ফ্ল্যাটে বাস করতে থাকেন এবং খুব সতর্কতার সহিত আগে-পিছে সশস্ত্র গার্ড নিয়ে বের হতেন। এক মনোরম সন্ধ্যায় তিনি নিজে হাতে পিস্তল ও সশস্ত্র দেহ রক্ষীদের নিয়ে সাইকেল পথে বের হন। ভগবানের কৃপায় যে দু-দু'বার আততায়ীর আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে, বিধাতা তাকে বিপ্লবী দল নির্মূল করার জন্যই বাঁচিয়ে রেখেছে, এইটাই তার একান্ত বিশ্বাস। কিন্তু বেযাড়াস্বভাবের স্বদেশী দলের লোকগুলি ভগবানের ইঙ্গিত বুঝলেন না।

বাংলা সরকারের প্রধান গোয়েন্দা পুলিশকে তারা ঐ সাইকেলের উপরই গুলি চালিয়ে মেরে ফেল্লেন, একজন দেহরক্ষীও আহত হয়ে পড়ে যায়, অপর দেহরক্ষী সাইকেলে কোথায় যে ছুটে দিল তা দেখা গেল না, পুলিশ ব্যারাকের কাছেই সশস্ত্র পুলিশ রক্ষীদের মাঝখান থেকে একজন বড় পুলিশ সাহেবের প্রাণ উড়ে গেল সন্ধ্যার আলোকিত পথে। তিন তিনবারের চেষ্টায় প্রধান পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করার দুঃসাহসে ও ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হয়ে বাংলার গভর্ণর সর্বত্র অত্যাচারের লাগাম ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন। দল নির্মূল করার জন্য অসংখ্য কর্মীদের গ্রেপ্তার আরম্ভ হল, মেসে-বোর্ডিংয়ে ছাত্রদের উপর হামলা চলল। পুলিশ অফিস ও গোয়েন্দা হাউসে যুবকদের ধরে এনে নিষ্ঠুর নির্যাতনের হিড়িক

পড়ে গেল। দল কিন্তু নির্মূল হল না। পলাতক কর্মীরা সহরের মধ্যেই আত্মগোপন করে রইলেন সমর্থকদের সাহায্যে। 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ-হাসপাতাল' পরিদর্শনে যান বাংলার আই. বি. পুলিশের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার জেনারেল লোমান সাহেব, সঙ্গে ঢাকা জেলার পুলিশ সাহেব হডসনও আছেন। দিন-দুপরে ছাত্র, ডাক্তার ও রুগীদের সম্মুখে লোমান সাহেবকে ও পুলিশ সাহেবকে গুলি করে ছাত্র বিনয় বসু ও অন্যান্য কয়েকজন চলে গেলেন। কেউই তাদের ধরতে আসে নাই, পুলিশ প্রহরীরাও না। লোমান সাহেব মারা গেলেন, হডসন সাহেব আহত হলেন। এমনি আরো অনেক দুর্ধর্ষ ঘটনা আছে।

আবার নিজের জীবন দিয়েও অত্যাচারী শাসন অবসানের জন্য রাজকর্মচারী-দের গুলি করা হয়েছে। এ বীরত্বের জন্য বিপ্লবীরা প্রশংসাও অর্জন করেছে। অত্যাচাব নিপীড়ন এত ভয়াবহ ছিল, জনসাধারণের অধিকার এত কম ছিল যে এ-ধরনের কাজ তখন আদৃতই হত।

কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বাংলার জেলসমূহের ইনস্‌পেক্টর জেনারেল সিম্পসন সাহেবকে হত্যা করায় দেশের লোক খুব আনন্দ পায়। জেলে জেলে রাজবন্দীদের উপর দারুণ অত্যাচার চলছিল, আবেদন নিবেদনে কোন প্রতিকার হয় নাই। এমন সময় কয়েকজন যুবক রাইটার্স বিল্ডিংস্‌য়ে ঢুকে সিম্পসন সাহেবকে হত্যা কবে অন্যান্যদের উপরও গুলি চালায়। সুধীর ও বিনয় আত্মহত্যা করেন। দীনেশ দাশগুপ্ত ফাঁসীতে জীবন দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তনের সময় বাংলার গভর্ণর এণ্ডারসন সাহেবকে লক্ষ্য করে স্নাতক ছাত্রী বীণা দাস গুলি ছোড়েন—গুলি ব্যর্থ হয়। বীণা জেলে গেলেন। এণ্ডারসন সাহেব আয়ারল্যাণ্ডে বিপ্লবীদের উপর অত্যাচাবে হাত পাকিয়ে বাংলার গর্ভনরপদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

কুমিল্লার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্‌সকে শান্তি-সুনীতি (দুটি স্কুলের ছাত্রী) গুলি করে হত্যা করেন। এরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গোপীনাথ সাহা কলকাতায় কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ভ্রমে অপর একজন সাহেবকে গুলি করেন। গোপীনাথ ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ফাঁসীর আদেশ পেয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমার রক্ত বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ ছড়িয়ে দেবে।' পরবর্তী সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে গোপীনাথের দেশপ্রেম ও সাহসের প্রশংসাসূচক প্রস্তাব গৃহীত

হয়েছিল। মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জকে ফুটবল খেলার মাঠে গুলি করা হয়। পুলিশ পরিবেষ্টনের মধ্যে বার্জ সাহেবের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে। অনাথ ও মৃগেনকে পুলিশ তৎক্ষণাৎ গুলি করে হত্যা করে। অপর ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসী দেওয়া হয়। একটি কিশোর বালককে পুলিশ প্রহার করে মেরে ফেলে।

এরূপ অসংখ্য ঘটনার মধ্যে কয়েকটি লিখিত হল। একদিকে পুলিশী-শাসন নির্যাতন—অপরদিকে দুর্জয় প্রতিরোধে বিপ্লব দলের শক্তি বৃদ্ধি। শিক্ষিত -অশিক্ষিত জনগণ বিপ্লবীদের সাফল্য ও ইংরেজ শক্তির পতন কামনা করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে জঙ্গলাকীর্ণ বুড়ীবালাম নদীর তীরে একদল দুর্ধর্ষ বিপ্লবীর সহিত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর লড়াই হয়। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা যতীন মুখোপাধ্যায় ও তার চারজন সহকর্মীর সহিত সশস্ত্র পুলিশ ও রাইফেলধারী অশ্বারোহী বাহিনীর সংঘর্ষ বাঁধে, পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ না করে বীরের মতো শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করাই তারা শ্রেয় মনে করেন, তাতে প্রাণ যায় যাক্। নদী তীরের বালুকা রাশির মধ্যে ট্রেঞ্চ কেটে তার ভিতর থেকে তারা পুলিশের উপর গুলি চালান। দীর্ঘকাল উভয় পক্ষে লড়াই হয়। শত্রুপক্ষের কয়েকজন নিহত হল,—শেষ অবধি যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয় গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যান। দুজন ধরা পড়ে ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ দেন। অপর একজন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে পরে উন্মাদ অবস্থায় জেলে মারা যান।

১৯১৮ সালে গৌহাটি পাহাড়ে একদল বিপ্লবীর সহিত রাইফেলধারী অসমীয়া পুলিশের লড়াই হয়। পাহাড়ের আড়াল থেকে বিদ্রোহীরা দু'দিন অবধি পুলিশের উপর 'মসা'র পিস্তলের গুলি বর্ষণ করে। বিপ্লবীরা পাহাড়ের ওপর থেকে গুলি ছুঁড়ছেন, পুলিশ নীচ থেকে রাইফেলের গুলি চালায়: সন্ধ্যার অন্ধকারে পুলিশ পালিয়ে দূরে চলে যায়। পরদিন অসংখ্য পুলিশ পাহাড় ঘেরাও করে অপর পাহাড়ের উপর থেকে আক্রমণ করে। রাইফেলের বেয়নেট সূর্য কিরণে ঝক্ঝক্ করতে দেখে যুবকগণ মসার পিস্তল হাতে তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নেমে গিয়ে বড় বড় পাথর খণ্ড আড়াল করে দাঁড়ান। দীর্ঘ সময় গুলি চলে। বুলেট ফুরিয়ে গেছে বুঝতে পেরে পুলিশদল রাইফেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিপ্লবীদের কাছে এগিয়ে আসে। নেতা নলিনী ঘোষ ও অপর কয়েকজন আহত হয়ে ধরা পড়েন। নলিনী বাকচী ও আরো দু-একজন অন্ধকারে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সরে পড়েন। কিছুকাল পরে নলিনী বাকচী

ও তারিণী ঢাকায় বীরত্বের সহিত লড়াই করে বহু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। মরণের প্রাক্কালে নলিনী পুলিশকে বলেন, "আমাকে নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করবেন না, আমায় শান্তিতে মরতে দিন।" নলিনী শেষ নিশ্বাস ফেললেন। পুলিশ জানতেই পারল না কে এ বীর যুবক।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করে বিপ্লবী বাহিনী অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। অস্ত্রাগার থেকে পুলিশদল অস্ত্র ছেড়েই পালিয়ে যায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যান। পরে পুলিশ ও সেনা সমাবেশ করে সরকার পক্ষ সহর পুনবদখল করে নেয়। তারপর সুরু হয় জিলায়-জিলায়, পাহাড়ে-পাহাড়ে গোরা সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবী বাহিনীর খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ। জালালাবাদের যুদ্ধই তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তীব্র। বিপ্লবীরা ১২ জন শত্রুর গুলিতে মরে, সরকারী সৈন্য কতজন মারা গেছে তার সংখ্যা জানা যায় নাই। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনকে ফাঁসী দেয়। আরো কতজন ফাঁসীতে ও গুলিতে মরে। অবস্থা ও জনচেতনা পরিবর্ত্তনের ফলে এরপর বিপ্লবের লক্ষ্য, সংগঠন, কার্যপদ্ধতি উচ্চপর্যায়ে উঠে যাওয়ায় বিপ্লবী নেতারা পরে নূতন সমাজতান্ত্রিক গণবিপ্লবের পথে আত্মনিয়োগ করেন। জন সমর্থন ছিল বলেই প্রাথমিক সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম দিনদিন বিস্তার লাভ করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ভারতের পূর্ব প্রান্ত হতে, পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে সশস্ত্র দল সংঘটিত হয়ে ইংরেজ শাসকদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে পঞ্চাশটা জার্মান 'মসা'-র পিস্তল পেয়ে বাংলার বিপ্লবীরা বাংলা গভর্নমেন্টকে প্রায় অচল করে দিয়েছিল। ফাঁসী, গুলি, দীর্ঘ কারাদণ্ড, অমানুষিক পুলিশ নির্যাতন—কোন কিছুতেই ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী বিপ্লবীদলকে নির্মূল করতে পারে নাই। জনসমর্থন পেয়ে জনগণের মধ্যেই তাঁরা বেঁচে ছিল, দল পুষ্ট করে ছিল। পরে গণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণসংগঠন গড়ে ওঠার ফলে মধ্যবিত্ত সশস্ত্র বিপ্লবীপন্থীরা তাদের সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা পরিহার করে বৃহত্তর গণবিপ্লবের পথে ঝুঁকে পড়ে।

বিংশ শতাব্দী।
কার্ত্তিক ১৩৭৩,
সম্পাদক-হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

[প্রবন্ধটির শিরোনাম ছাপা হয়েছিল 'প্রাথমিক স্বাধীনতা সংগ্রাম।" ছাপার পরে সতীশ পাকড়াশি পাণ্ডুলিপিতে পাল্টে এই শিরোনাম দেন]

১ বসন্ত চ্যাটার্জী হত্যাকারীদের মধ্যে সতীশ পাকড়াশী ছিলেন। তাঁর গুলিতে বসন্ত চ্যাটার্জী নিহত হয়।

২ এই "দু-একজনের" মধ্যে সতীশ পাকরাশী একজন ছিলেন।

স্বদেশী ডাকাতি

ছোটবেলা আমরা ডাকাতির গল্প শুনে শিউরে উঠতাম। কিন্তু ডাকাত যে কত নির্মম হতে পারে তা "অভিশপ্ত চম্বল" না-পড়লে বা চম্বলের ডাকাতির কাহিনী না শুনলে ধারণা করতে পারতাম না। নির্বিকার চিত্তে যাকে খুশি তাকেই তারা হত্যা করে, যত জনকে খুশি তত জনকেই হত্যা করে। দোষী-নির্দোষীর বাছ-বিচার নাই। অনায়াসে মানুষ খুন করে ফেলে। এই নিষ্ঠুর কাজই তাদের পেশা। পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হলে নির্ভীকভাবে পুলিসের উপর গুলি চালায়,—মারে এবং মরেও। দীর্ঘকাল ধরে এই নৃশংস ডাকাত দলের ডাকাতি চল'ছে চম্বলে। বিলাতী কোম্পানীর আমলে উত্তর বঙ্গে 'সন্তানদল' সরকারী টাকা লুঠে নিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'দেবী চৌধুরাণীর' ডাকাত দলের কথা আমরা পড়েছি। এ-দলের ডাকাতির অর্জিত অর্থ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হত।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাংলার যুবশক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে দিকে দিকে ঐক্যবদ্ধ যুবসংগঠন গড়ে তোলে; ইংরাজ সরকার এতে ভীত হয়ে কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে যুবকদের বিভিন্ন সংঘ সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করে সংগঠনগুলি ভেঙ্গে দেয়। স্বাধীনতা-সংগ্রাম স্পৃহা তাতে রুদ্ধ হয় নাই। যুবশক্তি তখন গুপ্ত সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের মুক্তিবিপ্লব পথে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

পিস্তল-বন্দুক সংগ্রহ, বোমা তৈরীর জন্য বিস্ফোরক দ্রব্যাদি কেনার প্রয়োজনে প্রচুর টাকার দরকার। প্রকাশ্যে যে-টাকা সংগ্রহ করে তারা যুব সংগঠন চালিয়েছিল, এখন সরকারী দমন নীতির কঠোরতায় সে অর্থ-সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। অস্ত্রের জন্য, পরিচালনার জন্য, দল বিদ্রোহাত্মক বই-পুস্তিকা

ছাপিয়ে জনমনে স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনা জাগানোর জন্য যে টাকা না হলে চলে না, সে টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? ইংরাজ দৈত্য-রাজত্ব শেষ করার জন্য সুগঠিত, সশস্ত্র বিপ্লব, দল পরিচালনায় সুব্যবস্থা ভিন্ন তো দুর্ধর্ষ বিদেশী শাসন শৃঙ্খল ছিন্ন করা যাবে না।

—এ সব কিছুর জন্য টাকার প্রয়োজন। বিত্তসম্পদ যেমন মানুষের মনুষ্যত্বের স্থলে পশুত্ববোধ জাগরণে সহায়তা করে তেমনি অপরদিকে কিন্তু সৃষ্টিশীল বা গঠনমূলক কাজের সহায়তা করে। কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে—কে দেবে টাকা? আজকের দিনের মতো চাঁদা তুলে, সমর্থকদের মোটা সাহায্য পেয়ে দলের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করার উপায় ছিল না। বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তা সংগ্রহ করার উপায়ান্তর না-দেখে বিপ্লব দলের লোকেরা ডাকাতির পন্থা গ্রহণ করেছিল। বিপ্লবদলের কোন প্রতিনিধি একজন সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট টাকা চাহিতে গেলে ভয়ে অস্বীকার করতেন অথচ তিনিই হয়ত গ্রামে সরকারী কর্মচারী এলে এমনকি থানার দারোগা এলেও মোটা টাকা খরচ করে তাকে তুষ্ট করতেন। তখনকার দিনে উপরওয়ালা এলে ভেট দিতে হত। স্কুলের ইন্‌স্পেক্টার, অফিসের ইন্‌স্পেক্টার, বে-সরকারী ব্যবসায়ী কোম্পানীর ইন্‌স্পেক্টটার পরিদর্শনে এলে স্ব-স্ব বিভাগীয় সকলকেই মূল্যবান কিছু কিনে ওঁর তুষ্টিসাধন করত।

কেহ স্বেচ্ছায় কেহ বা বাধ্য হয়ে বার বার টাকার অপচয় করতেন, অথচ বিপ্লব দলের কাজে অতি গোপনেও সাহায্য করতেন না। টাকা চাইতে গেলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চুপি-চুপি ফিরে যেতে অনুরোধ করতেন। ইংরেজ-শাসন ভীতিটা ছিল প্রবল। স্বদেশী আন্দোলন থেকে এদের ডাকাতির নাম চালু হয় —"স্বদেশী ডাকাতি"। আসলে ইহা ছিল "রাজনৈতিক ডাকাতি"।

ডাকাতিতে পাওয়া টাকার একটি পয়সাও বিপ্লবী-দলের কর্মীরা নিজস্বার্থে বা নিজের এতটুকু সুবিধার জন্য ব্যয় করতেন না। সব কিছুই পার্টির সম্পদ; পার্টির শক্তি বৃদ্ধির কাজে—সংগঠনের কাজে—এবং অস্ত্র সংগ্রহের জরুরী প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় হত। যথেচ্ছভাবে নয়, হিসেব করে।

কর্মীরা সকলে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বিপ্লবী সংগ্রামের ডাকে রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হয়ে দেশ স্বাধীনতার আকুল আগ্রহে কাজ করে যাচ্ছিলেন। নিজ নিজ স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে নিষ্ঠার সাথে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। টাকা-পয়সার লোভ তাদের ছিল না। ডাকাতিতে অর্জিত

প্রতিটি পয়সা তাদের কাছে পবিত্র। দেশাত্মবোধই তাদের অন্তরের ধ্যান।

এক

১৯০৮ সালের কথা। ঢাকা জিলার বাঢড়া গ্রামে কুখ্যাত ধনী মহাজন শশী সরকারের বাড়িতে এক রাত্রে এক দল যুবক ডাকাতি করতে আসে—পিস্তল-বন্দুক বড় বড় ছোরা তাদের হাতে। অস্ত্রসজ্জিত ডাকাত দল ঢাকা থেকে নৌকা করে গ্রামে উপস্থিত হয়েই শশী সরকারের বাড়ি গিয়ে অন্দর-মহলের একটি নির্দিষ্ট ঘরে জোর করে প্রবেশ করে। ডাকাতের হাতে অস্ত্র, মুখে সরে দাঁড়াবার কড়া হুকুম। ভয়ে বাড়ির লোকজন সরে গিয়ে বিকট চীৎকার করতে করতে দৌড়ে গেল বাইরের দিকে। একজন ছুটে গিয়ে বিভলভার উঁচিয়ে বলল কেউ বাইরে যেতে পারবেন না। এদিকে পাকা ঘরে প্রবেশ করে টাকা ও অলঙ্কারগুলিকে থলির মধ্যে ভরে নেবার সময় বাইরে চীৎকার ও সোরগোল শোনা গেল—'ডাকাত, ডাকাত'। গ্রামবাসীরা লাঠি সোটা নিয়ে ছুটে এসে বাধা দিতে উদ্যত হয়।

দা-বর্শা হাতে আক্রমণোদ্যত লোকেদের হৈ-চৈ-এর মধ্যে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। গ্রামবাসীরা কিছুটা পিছনে হটে গিয়ে 'মার' 'মার' বলে চেঁচাতে লাগল—কেউ এগুতে সাহস পাচ্ছেনা গুলির সামনে। ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠে, "গরীবের রক্তচোষা-শালা-সুদখোরের সর্বস্ব নিয়ে যাক।"

ডাকাতরা মালকোঁচা মারা ধুতি পরে মাথায় পাগড়ী বেঁধে এসেছিল।—চেঁচিয়ে বলল—"আমরা স্বদেশী ডাকাত। দেশের ভালোর জন্যই সুদখোর মহাজনের টাকাগুলি নিয়ে যাচ্ছি আমাদের বাধা দিবেন না।" শুনে গ্রাম বাসীরা থমকে দাঁড়ালো। এমন সময় দূর থেকে চেঁচামেচী শুনে বহুলোক ছুটে এসে পড়ে। এক মোড়ল বলে ওঠে, "ডাকাতদের ওসব ভাঁওতা, স্বদেশী-টদেশী কিছু নয় ওরা।" লোকগুলি বর্শা ও বল্লম হাতে এক-পা, দু'পা করে এগিয়ে আসে ডাকাতদের দিকে। আবার গুলির আওয়াজ—জনতা বহুদূর পিছিয়ে গেল। ঘর থেকে মেয়েদের কান্নার রোল শোনা যায়, অন্দর মহলের পাহারারত ডাকাত সর্দার বলল, "মা! আপনাদের কোন বিপদ হবে না। চুপ করুন।"

রাত শেষ হয়ে এসেছে। আর থাকা সমীচীন নয় বুঝে ডাকাতরা নগদ টাকা ও

অলঙ্কার সহ প্রায় ২৫/২৬ হাজার টাকা নিয়ে বাঁশি বাজিয়ে শৃঙ্খলার সাথে নৌকাভিমুখে চলল। তখন গ্রামবাসী বহুলোক চৌকিদারের নেতৃত্বে ডাকাত দলের পিছে ধাওয়া করলে এবং ডাকাতদের লক্ষ করে লাঠি বল্লম ছুঁড়তে আরম্ভ করে। এবার ডাকাতরা সত্যি সত্যি গুলি চালিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবমান চৌকিদারকে হত্যা করে।

ধনী মহাজনের বাড়ির অনুগতদের বল্লমের আঘাতে কয়েকজন ডাকাতও অবশ্য আহত হয়।

নৌকা পথে ফিরে যাওয়ার সময় থানার পুলিশবাহিনী ও গ্রামের লোক একত্র হয়ে ভোরবেলা ডাকাতের নৌকার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে। তখন উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হতে থাকে। এর ফলে কয়েকজন গ্রামের লোক ও ডাকাত দলের একজন লোক নিহত হয়। ডাকাতের গুলি বর্ষণে পুলিশ গ্রামবাসীরা সকলেই পিছু হটে যায় এবং ডাকাতদের অনুসরণ করা থেকে বিরত হয়।

ছোট নদীর দু-পাড় থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ডাকাতের নৌকা বড় নদীতে গিয়ে পড়তে চায় দ্রুত গতিতে। আর নৌকা ছোট নদীর মধ্যে থাকতে থাকতে উহা ধরার জন্য লোক ছুটাছুটি করছে। বাঁচার জন্যই ডাকাতের নৌকা ছুটে চলেছে দাঁড় বেয়ে। বিপদ আর কাটে না, কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে নৌকার ছইয়ের উপর বসে পর্যবেক্ষণরত ডাকাত যুবক দেখে আরও একদল লোক নৌকার পথরোধ করার জন্য মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যুবকটি বন্দুকটা তাদের দিকে নিশানা করা উঠে দাঁড়ালো। ভিতরে অন্যান্য সকলে প্রস্তুত। চার জন জোয়ান ঘর্মাক্ত হয়ে দাঁড় টেনে চলেছে। নদীর উভয় তীরে গৃহকর্মেনিরতা মেয়েরা ডাকাতের নৌকা শুনেই বাসন-কোসন ফেলে পালাচ্ছে। পাড় হতে ঢিল আসতে লাগে নৌকারোহী ডাকাতের উপর, কেহ কেহ মারাত্মক বর্শা ছুঁড়ে মারে। ডাকাতরা তাদের দিকে বন্দুক ধরে ফাঁকা আওয়াজ করছে, লোকগুলি ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়। এরূপ বার বার আক্রমণ চলছে নৌকার উপর। ডাকাত দল নানা কৌশলে গুলি না-চালিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে কখনো বা নীচে নেমে গুণ টেনে সকল বাধা এড়িয়ে চলে যেতে সক্ষম হয়। খাল থেকে বড় নদী-মুখে এসে পড়ল নৌকা।

এখানে নতুন বিপদ উপস্থিত। পুলিশ স্টীমলঞ্চ নিয়ে নৌকার পিছনে

ছোটে। ডাকাতরা দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে লঞ্চের চেয়েও দ্রুতগতিতে নৌকা বেয়ে চলে—পিছনে পিছনে পুলিশের লঞ্চ-ষ্টীমার ছুটে আসছে। নৌকা তীরবেগে নদীবেয়ে অপর এক খালের ভিতর দিয়া অদৃশ্য হযে যায়। লুণ্ঠিত অর্থ, অলঙ্কার ও নিহত সহযোদ্ধাসহ ডাকাতদল নিরাপদে ঢাকায় পেঁাছে যায় সকালবেলা। বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গের নদীপ্লাবনে অসংখ্য খাল-খাড়ি দিযা জল প্রবাহ দূর গ্রামাঞ্চলে চলে যায়; নৌকাপথে অবাধ যাতাযাতের সুযোগ উপস্থিত হয়। ডাকাতদল সে-সুযোগ লাগিয়ে পালিয়ে গেল। ঢাকার পুলিশ বিপ্লবীদলের সহিত সংশ্লিষ্ট তিন জন শিক্ষিত যুবককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু কিছুদিন পর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।...

বাড়ির প্ল্যান, টাকা ও অলঙ্কারাদি রাখার স্থান তাদের পূর্বেই জানা ছিল বলে পুলিশ সন্দেহ করে। অপূর্ব কৌশলে ঠাণ্ডা মাথায় তারা কাজ হাসিল করেছে। একজন মাত্র উগ্র 'আক্রমণকারী' চৌকিদার ছাড়া কাকেও হত্যা করে নাই। বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ কারো উপর কোন নির্যাতনও করে নাই।

পুলিশ এ ডাকাতির কোন সন্ধান সূত্র বার করতে পারে নাই। পরে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে ডাকাতির অপূর্ব সাফল্যে পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় যুবকগণ উৎসাহিত হয় এবং "অনুশীলন" গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেয়। স্থানীয় সাধারণ লোক পরে সবকিছু বুঝতে পেরে অসৎ ধনীর সম্পদ কেড়ে নেওয়ার তারিফ করে।

দুই

...১৯১৭ সালের ১৭ই অক্টোবর ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাপুর গ্রামে নাটকীয় ধরনের এক ডাকাতি হয়। এক অভিনয় চলার সময়ই আর এক অভিনয় দর্শকদের বিস্মিত ও চমকিত করে দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে সরকারী নিষ্পেষণের প্রকোপে বিপ্লবীদল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পুলিশ বার বার দলের সংযোগ সূত্র ছিন্ন করে দিয়াছে; কর্মী ও নেতারা ঐ দলকে আবার সংযোজিত ও সংগঠিত করেছে। অস্ত্রাদি বার করে নিয়ে গেছে, আবার অতিকষ্টে অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে, এর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে খুব বেশী। পুলিশ দল ভেঙ্গে দিলেও বিপ্লবীদের দল সংগঠিত, করতেই হবে।- অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গেলেও আবার অস্ত্র সংগ্রহ

করতেই হবে। এই কাজ চালিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের শক্তি সুদৃঢ় করতে হলে অর্থ আবশ্যক। টাকা না হলে কোন কাজই হয় না।

দলের আর্থিক প্রয়োজন মিটানো ও যুবকচিত্তে নূতন উদ্দীপনা জাগানোর দিকে দৃষ্টি রেখে এই দুঃসাহসিক ডাকাতির আয়োজন করা হয়। শক্তি সাহস ও চমকপদ কর্মকুশলতা দেখিয়ে ধনীর পাপার্জিত ধন কেড়ে আনার উদ্দেশ্য জনসাধারণের নিকট নিন্দিত এক ধনবান ব্যক্তির বাড়িতে ঢাকার বিপ্লবী যুবকদল ডাকাতি করে টাকা আনার প্ল্যান করে।

বাড়িতে যাত্রার গান চলছে। চারদিকের গ্রাম থেকে অগণিত লোক যাত্রা দেখতে এসেছে। রাত্রে যাত্রার আসর জমেছে ভালো—দর্শকগণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। অকস্মাৎ বিউগল (Bugle) বেজে উঠল। এও কি যাত্রার একটি অভিনয়? - না, লোকের চমক ভাঙল। ক্ষিপ্রগতিতে হাফসার্ট, হাফপ্যাণ্ট পরা সুন্দর-বলিষ্ঠ যুবকগণ পিস্তল-রিভলভার উচিয়ে কোণে কোণে দাঁড়িয়ে গেল। অকস্মাৎ বন্দুকের আওয়াজ ও বিউগলের ধ্বনি। যাত্রা গানের আসরের মাঝে যে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়েছিল তাঁর হুকুম হল, "কেউ এক-পা নড়বেন না, যে যেখানে আছেন সেখানেই বসে থাকুন। আর যারা কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন ধীরে ধীরে বসে পড়ুন।" দর্শকগণ ত্রস্ত-ভীত-চঞ্চল, হতভম্ব হয়ে গেছে তাঁরা। বাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার শুনা গেল,"—আমার সব নিয়ে গেল রে - সব নিয়ে গেল।" তৎক্ষণাৎ পর পর তিনটি পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ হল। যাত্রা গানের আসরে অভিনেতারা যে পোশাক পরে অভিনয় করছিল পোশাক পরা অবস্থাতেই বসে বসে বিড়ি ফুঁকতে লাগল। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। কেবল কানাকানি ফিস্‌-ফাস্‌ শুনা যায়। মহিলা দর্শকদের গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে।······

চাঞ্চল্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় দলের নেতা হাত বাড়িয়ে পিস্তল দেখিয়ে উঁচু গলায় বলে ওঠে—"সকলেই শুয়ে পড়ুন, যে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে তারই মাথায় গুলি লাগবে।" ডাকাতের এ কড়া হুকুম অমান্য করে কার সাধ্য। এমন সুকৌশলে ডাকাতদল বাড়িটা ঘেরাও করে ফেলেছিল যে একটি লোকও বাইরে চলে যাবার সুযোগ পায় নাই।

অভিনয়ের সময় যেমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, ডাকাতির অভিনয়েও তাই বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছে, সকলের মনে ভীতিসঞ্চার করে। একজন জোরে বলে উঠে, "এরা স্বদেশী ডাকাতের দল"। ডাকাত সর্দার চেঁচিয়ে বলে,—এ

বাড়ির টাকা যায়তো আপনাদের ক্ষতি কি? আপনারা তো কেউ এ-বাড়ি থেকে কোনও সাহায্য পান না? আপনাদের টাকা নিয়েই বাড়িওয়ালা দারোগা, ইনস্পেক্টার ও রাজকর্মচারীদের দেয় ও তোষণ করে। আমরা এ-টাকা সদব্যয় করব। দেশের স্বাধীনতার কাজে ব্যয় করব। স্ক্রীনের ভিতরে মহিলা দর্শকদের নিকট অলঙ্কার ভিক্ষা চাওয়া হ'ল। ডাকাত সর্দার বলল, "এ-বাড়ির টাকা নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা অলঙ্কারগুলো খুলে দিয়ে দিন। দেশের মানুষের মুক্তির জন্যই আমরা আপনাদের অলঙ্কারের সদ্ব্যবহার করব। দেশ স্বাধীন হলে আপনারা অনেক পাবেন।"

দু'একজন মহিলা সামান্য কিছু অলঙ্কার খুলে দিলেন। ডাকাতরূপী—বিপ্লবী যুবক বললেন, "যুদ্ধভাণ্ডারে টাকা দিয়ে আপনারা, আপনাদের স্বামী-পুত্ররা ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করেছেন। আমাদের দিবেন না কেন? দিনতো দিন নইলে—" ভিতর থেকে কান্নার রোল উঠল। আরও কয়েকটি অলঙ্কার বেরিয়ে আসে।

তখন আধঘণ্টা সময় চলে গেছে। সিন্দুকের প্রায় বত্রিশ হাজার টাকা ও সোনার তাল ডাকাতদের হস্তগত হয়েছে। বাড়ির মালিকের বন্দুকটিও তারা কাঁধে তুলে নিয়েছে এ-সময় বিউগল বেজে উঠল। ডাকাতদের কাজ শেষ। আর এক মুহূর্তও বিলম্ব নয়। যুবকগণ যার যার জায়গা ছেড়ে রিভলভার উচ্চে তুলে ধরে এক লাইন হয়ে দাঁড়ালো। হুকুম হল মার্চ করার। সহস্রাধিক যাত্রী-দর্শক কৌতুহলী দৃষ্টিতে বিউগ্‌ল-এর তালে তালে স্বদেশী সৈন্যের দ্রুত পদক্ষেপের আওয়াজ শুনছে, আর অবাক হয়ে বিহ্বলভাবে চেয়ে দেখছে। সংখ্যায় তারা ত্রিশ জনেরও বেশী। লুণ্ঠিত টাকা ও অলঙ্কার তাদের কাঁধের থলিতে ঝুলছে। এ-বাড়ির বন্দুকটিও তারা কাঁধে তুলে নিয়েছে। সৈনিকের কায়দায় মার্চ করে তারা দৃষ্টি পথের বাইরে চলে যাচ্ছে। পরে যখন সম্বিৎফিরে এল তখন সকলে দূরাগত বিউগ্‌ল্-এর ধ্বনি অনুসরণ করে ডাকাতদের ধরতে ছুটল। কিন্তু ডাকাতের দল দূরে খরস্রোতা নদীপ্রবাহে নৌকা ভাসিয়ে দিয়াছে। বিউগ্‌ল্-এর আওয়াজ থেমে গেছে। ধূ-ধূ অন্ধকার তরঙ্গায়িত মেঘনার বুকের ওপর দিয়া ডাকাতের নৌকা ছুটে চলেছে কোন্ অজানা তীরের পানে।

টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছিল বলে ঢাকায় খবর দেওয়া যায় নাই। যাত্রাগান আর হয় নাই। বাড়ির কর্তা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঘরে বন্দী হয়ে

ছিল। তাঁকে মুক্ত করা হল। যাত্রাভিনয় ও ডাকাতি অভিনয় দুইই শেষ হল

যাত্রাভিনয়ের দর্শকগণের কোন সন্দেহ ছিল না যে এ-ডাকাতি স্বদেশী ডাকাত দলেরই কাজ। শিক্ষিত যুবকদল স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী 'গুপ্ত সমিতি' করেছে। ঐ গুপ্ত সমিতির কর্মীরাই ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করে। আবদুল্লা-পুর ডাকাতিতে ডাকাতদল যে নৈপুণ্য দেখিয়ে সুকৌশলে কাজ করেছে, এবং নিয়মানুবর্তিতা, ক্ষিপ্রতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে তা অপূর্ব। একটি লোককেও তারা গুলি করে মারে নাই বা আহত করে নাই। সাধারণ ডাকাত দলের পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব। আই. বি. পুলিশের দক্ষতা থাকলেও তারা এ-ডাকাতির কোনই হদিশ করতে পারে নাই। কত লোককে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করেছে। কিন্তু ডাকাতদলের সন্ধান মিলে নাই।...

তিন

১৯৩৩-সাল ; অক্টোবর শেষে উত্তরবঙ্গের হিলি রেল স্টেশনে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। বেশী টাকা আনতে গেলে দুঃসাহসিক কার্যক্ষমতা না থাকলে তা হয় না—তা ছাড়া রেল, পোস্টঅফিসে যে-টাকা আসে তা সরকারী টাকারই তুল্য, সেখানে বাধাও বেশী। 'হিলি' সে-সময় বগুরা জিলার মধ্যে একটি বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান—পাট ও অন্যান্য কাঁচামালের কারবারের জন্য খ্যাত। কলকাতা থেকে দার্জিলিং ও আসামের গাড়ি হিলি স্টেশনের মাল নিয়ে যাতায়াত করে। নিকটবর্তী বালুরঘাট মহকুমা শহরের স্টেশনও হিলি। কাজেই হিলি রেল স্টেশনের গুরুত্ব আছে। প্রতিমাসে কলকাতা থেকে মেলগাড়িতে এখানে অনেক টাকা আসে। বিপ্লবী দলের লোক টাকা আনার তারিখ জেনে নিয়েছিল। পুলিশ ফাঁড়িতে, স্টেশন মাস্টারের বাসায়, ও হিলির বড় মহাজনদের ঘরে বন্দুক আছে সে-খবরও সংগৃহীত হয়। তা সত্ত্বেও স্থির হয় হিলি রেল স্টেশনের টাকা হস্তগত করতে হবে।

গভীর আঁধার রাত। কলকাতার মেল-গাড়ি হিলি রেল স্টেশনে মেল ব্যাগ নামিয়ে দিয়ে দিগন্ত কাঁপিয়ে চলে গেল উত্তরের দিকে। ডাক-বিভাগের সকল থলেগুলি স্টেশন ঘরে ডাক-বিভাগের কাঠের সিন্দুকে রেখে দিয়ে ডাক নিয়ে যাওয়ার ভারপ্রাপ্ত দু'ব্যক্তি আর রেল স্টেশনের পিওন সিন্দুকটার

পাশেই শুয়ে পড়ল। রাত্রি প্রভাতে মেল-ব্যাগগুলি নিয়ে যাবে পোস্টঅফিসে। স্টেশনে যাত্রীর ভীড। যারা গাড়িতে এসে এখানে নেমেছে, আর যারা রাত্রি শেষের গাড়িতে যাবে, সকলেই শুয়ে পড়েছে—কেউ নিদ্রামগ্ন, কেউ বা অর্ধনিদ্রামগ্ন। যারা টাকা কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছে তারাও নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে জেগে শুয়ে আছে। বারোজন বলিষ্ঠ যুবক সময়ের প্রতীক্ষাতেই শুয়ে আছে। অকস্মাৎ তারা উঠেই মুহূর্তের মধ্যে স্টেশন ঘরে প্রবেশ করে সিন্দুক খুলতে গেল। ডাকরক্ষীরা চীৎকার করে বাধা দিতে গেলে ডাকাত যুবক তীব্র স্বরে বলে উঠল, "খবরদার হট্ যাও! নইলে এক্ষুণি খুন করে ফেলব," ব্যাপার বুঝে তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে রইল।

ডাকাতদের হাতের বন্দুক তাদের একেবারে অসাড় করে দেয়। শব্দ শুনে স্টেশনের পুলিশ প্রহরী ছুটে এল। ডাকাতরা তার দিকে গুলি ছুড়তেই সে চীৎকার করে 'ডাকাত' 'ডাকাত' বলতে বলতে পালিয়ে গেল, যাত্রীরা জেগে উঠেই উচ্চৈঃস্বরে সোরগোল আরম্ভ করে দেয়—কতক যাত্রী ভয়ে ছুটে চলে স্টেশনের বাইরে। পিওন ছুটে গেল স্টেশন মাস্টারকে খবর দিতে। চারদিকে চীৎকার—কলরোল, মেয়ে যাত্রীর সাহায্য-প্রার্থীর ডাক, দোহাই পারতে লাগে। কি যে ঘটেছে তাই অনেকে বুঝতে পারে নি!—এ গোলমালের সময় তিন চার জন ডাকাত ভিতরে ডাকের টাকাগুলি নেওয়ার কাজ করছিল। সিন্দুক ভেঙ্গে চাবি দেওয়া শীলমোহর মারা ব্যাগগুলি ছুরি দিয়া খুলে ইনসিওর করা খাম ও কয়েক হাজার টাকার নোট বার করে নেয়। ওয়েটিং রুমের ডাকাতরা তিনবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে ভীত যাত্রীদের ঠাণ্ডা হওয়ার কথা বলে। ডাকাত দলের নেতা প্রাণকৃষ্ণ বললে, "আপনারা ঘাবড়াবেন না, আমরা গভর্নমেণ্টের টাকা নিতে এসেছি। টাকা নিয়ে দেশ স্বাধীনতার কাজে তা নিয়োজিত করবো। আপনাদের কোন কিছু বিপদ নেই। আপনারা নীরব থাকুন।"

স্টেশন মাস্টার বন্দুক হাতে নিয়ে নিজের কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি ডাকাতদের দেখেনও নাই—পাশ দিয়ে যে ছুটে যাচ্ছে তাকেই লক্ষ্য করে গুলি চালান আর ডাকাডাকি করেন। পুলিশ ফাঁড়ীতেও কেউ খবর দিতে যায় নাই। গোলমাল শুনে তারা সেখানে সতর্ক হয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছে তখন হাঁকাতে হাঁকাতে স্টেশনের পুলিশ এসে

বললে, "ডাকু-ডাকু!"—এর বেশী কথা আর তার মুখ দিয়ে বের হয় নি। ওদিকে স্টেশন মাস্টারের গুলিতে কে একজন নিহত।

চারদিক থেকে ডাকাত ধরার জন্য লোক ছুটে আসছে ফাঁড়ির পুলিশরাও বন্দুক ও লাঠি নিয়ে আসছে। ডাকাতরাও গুলি ছুঁড়ে সকলকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করছে। সাত-আট মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ।

হাজার হাজার টাকার নোট, আরো বেশী টাকার ইনসিওর করা খাম নিজেদের থলিতে ভরে ডাকাত দল গুলি করতে করতে ছয়-সাতজন অনুসরণকারীকে গুলিবিদ্ধ করে "দ্রুত গতিতে" চলতে থাকে। আহতদের মধ্যে একজনও মারা যায়।···রাত্রির আঁধারে পল্লী গ্রামের পথে তারা হেঁটে চলে।··· দীর্ঘ বিশ মাইল পথ হেঁটে তারা ক্লান্ত। ক্ষুধার্তও তারা। রাত্রের পর সারাদিন খররোদে হেঁটে তারা অচল হয়ে পড়েছিল। তারপর গরুর গাড়ি করে আত্রেই নদীর ধারে এসে এক কাছারী বাড়ির সামনে বিশ্রাম নিতে বসে। তখন বেলা পড়ে এসেছে। পথের মাঝে তিন-চার জনকে টাকা-পয়সাসহ অন্য পথে দলের কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। তারা নিরাপদে পৌঁছে যায় গন্তব্যস্থানে। কিন্তু বিপদে পড়ল তারা, যারা এ পথে এল। হিলি থেকে চারদিকে সাইকেলে ছদ্মবেশী পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই রাত্রেই। ডাকাতের সন্ধানে তারা স্থানে স্থানে লোক পাঠিয়ে দেয়। এক সাইকেল আরোহী পুলিশ কিছু সন্দিগ্ধ পথযাত্রীর অনুসরণও করে। আত্রেই নদীতীরে কাছারীর সামনে যখন ডাকাতরা বিশ্রামরত তখন তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে এল কয়েকজন লোক, নানা প্রশ্নের উত্তরে ওরা খুশী হতে পারে নাই, বরঞ্চ সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। রাজনীতি দলের ডাকাত সন্দেহ করলেও অশিক্ষিত সাধারণ পল্লীর কেহ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নাই। গ্রামে যত গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিল, পুলিশ তাদের জড় করে ডাকাতদের ঘিরে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। লোক ক্রমশঃ এগিয়ে গেলে ডাকাতরা রুখে দাঁড়ায়। বাধা দিয়ে ছুটে যেতে চেষ্টা করে। বহু লোকের মাঝ থেকে যাওয়া সম্ভব হল না। ধস্তাধস্তি করে তারা ধরা পড়ে।···

বিশেষ আদালতের বিচারে চারজনের ফাঁসীর আদেশ হয় দল নেতা 'প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর,' 'হৃষীকেশ ভট্টাচার্য'ও তাদের মধ্যে ছিল। পরে ফাঁসীর আদেশ মকুব করে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। অন্য কয়েকজনেরও কারাদণ্ড হয়।

বিংশ শতাব্দী, আশ্বিন-১৩৭৪

বাংলার অতীত সংগ্রামের একটি ঘটনা

…সে যুগের বিপ্লবী সন্ত্রাসের একটি ঘটনা এখানে লেখা হল।

ঢাকা বুড়ীগঙ্গার তীরে বাঁধের উপর দিয়া যে অসংখ্য লোক সান্ধ্য ভ্রমণরত ছিলেন। তাদের মধ্যে সরকারী গুপ্তচর বিভাগের একজন বড় অফিসার ও তাঁর দেহরক্ষী গুপ্তচরসহ সাধারণ ভদ্রলোকদের মতই পায়চারি করছিলেন। ঢাকা সহরের ছাত্র ও যুবকগণ দলে দলে বুড়ীগঙ্গার তীরে বেড়াত—বিপ্লবদলের যুবকগণও এখানেই তাঁদের গোপন আলোচনা চালাতেন। এখানেই হতো নতুন নতুন স্কুল কলেজের ছাত্রদের দলে ভিড়াবার যত কথাবার্তা। শোষণ-ক্লিষ্ট পরাধীন দেশের যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক গুপ্ত বিপ্লবদলের ইঙ্গিত পেলে যুবকগণ সহজেই দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত ঢাকা ছিল পূর্ববাংলার বিপ্লব কেন্দ্র—এখান থেকেই কর্মী ও সংগঠক তৈরী করে বাংলার সকল জিলা ও উত্তর ভারতের নানাস্থানে কাজের জন্য প্রেরণ করা হত।

এখানকার এ গুরুত্ব বুঝেই কলকাতা থেকে গুপ্ত পুলিশের বড় অফিসার ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর সহকারী রামদাসের পরামর্শমত বেড়াতে বেড়াতে চারদিক পর্যবেক্ষণ করছিলেন, ও বিশেষ বিশেষ পথচারীর জটলা-স্থানগুলি চিনে নিচ্ছিলেন। কলকাতা কেন্দ্রীয় অফিস থেকে তাঁকে ঢাকার গুপ্তদলের শক্তি, কর্মদক্ষতা ও অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হবে। নদী তীরবর্তী পার্কে যে রাজনৈতিক সভায় রাষ্ট্র-বিরোধী বক্তৃতা হচ্ছে ও ভলান্টিয়ার যুবকগণ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের দৃষ্টি সেদিকে নাই। তাদের শ্যেন দৃষ্টি বিপ্লবীদের উপর।

রামদাস পূর্বে বিপ্লবদলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে ভয়ে ও অর্থলোভে-পুলিশের সাহায্য করতে যেয়ে দলের গোপন কাজকর্ম ও কর্মীদের কথা প্রকাশ করতে থাকেন। আই. বি. অফিসারটি এ-জন্যই দক্ষ অসৎ ব্যক্তিটিকে সঙ্গে লয়ে ঢাকায় ঘোরাফেরা করতে এসেছিলেন। ভ্রমণরত সহস্র লোকের সান্ধ্য

ভ্রমণের শান্তি ভঙ্গ করে অকস্মাৎ রিভলভারের আওয়াজ, রামদাসের ভূতলে পতন। অফিসারটি একপাকে পাশের বুড়ীগঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে রক্ষা পেলেন। রাস্তার লোক মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কানাকানি হয়ে গেল মৃত ব্যক্তি পুলিশের গুপ্তচর। দর্শকগণ সরে পড়লেন সকলেই বুঝলেন 'বিপ্লবী দলের' কাজ।

তারপর মাস পরের দৃশ্য :

কলকাতার একটি বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে কয়েকজন পুলিশের গুপ্তচর ফিসফিস করে কথা বলছিলেন তাঁদের বড় সাহেব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবী ধরার প্ল্যান দিচ্ছিলেন। গেটে হেড কনেস্টবল পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে। ঢাকার দলের সম্পর্কে তিনি তার অভিজ্ঞতা অন্যান্য আই· বি· কর্মচারীদের বলছিলেন। বিপ্লবীদলের কর্মীরা এ অবস্থায় তাদের বসে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি বন্ধুদের লয়ে তৈরী হয়ে এলেন—এরই মধ্যে বসন্তবাবু চা খাওয়ার জন্য উপরে চলে যান। অকস্মাৎ দুটি বোমার দারুণ আওয়াজ। পিস্তল হাতে পাহারাওয়ালা মারা গেলেন। ভিতরের কর্মচারীরা আহত হয়ে আর্তনাদ করতে থাকেন।

বসন্তবাবুর স্ত্রী কেঁদে ফেললেন এবং স্বামীকে বললেন, 'ওগো এবার চাকরী ছেড়ে দাও। কাজ নেই আমাদের বড় চাকরীর গৌরবে।' ততক্ষণে সাহেবের হাত থেকে চায়ের কাপ টেবিলে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। বোমা নিক্ষেপকারীদের অনুসরণ করতে কেউ সাহস করে নাই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পরে বলেছিলেন : ভগবান আমার সহায়, দু'বার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। আমি ওদের নির্মূল করবই। এরপর এই অফিসারের নির্দেশেই কলকাতা ও ঢাকার শত শত ছাত্র ও যুবক গ্রেপ্তার হয় এবং ইলিসিয়াস পুলিশ অফিসে অমানুষিক নির্যাতন যন্ত্রণা ভোগ করেন। যুবকদের অভিভাবকদের উপরও নির্যাতন চলে।

তারও পরের দৃশ্য—শেষ দৃশ্য :

১৯১৬ সাল, ৩০ শে জুন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে, ইংরাজরা জার্মানদের হাতে খুব মার খাচ্ছে। এ-দেশেও জাতীয় আন্দোলন একেবারে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য ইংরাজ সব সময় উঠে পড়ে লেগেছে।

আই. বি· পুলিশের দেশীয় প্রধান কর্মকর্তা ইংরাজ অফিসারদের পদলেহী কুখ্যাত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবার খুব সুরক্ষিত

পুলিশ ব্যারাকের উপর বসা নিয়েছিলেন, ভবানীপুরে। প্রতিদিন সশস্ত্র দেহরক্ষী সহ যাতায়াত করেন—রাত্রে বড় বের হন না। এত সতর্কতার পরেও তার জীবনের নিরাপত্তার জন্য গভর্ণমেণ্ট এত অর্থ ব্যয় করার পরেও অকস্মাৎ অসংখ্য পথচারী যাতায়াতের মধ্যেই শ্রীবসন্ত চ্যাটার্জি ও তার দেহরক্ষীদের উপর গুলি বর্ষণ হয়। বসন্ত চ্যাটার্জি ও তার দেহরক্ষী উন্মুক্ত পিস্তলভাব হাতে ধরাশায়ী হলেন। অপর দেহরক্ষী অন্তর্ধান হলেন। বসন্ত চ্যাটার্জির দেহে বার বার গুলি বিদ্ধ করে তাকে শেষ করে দিয়ে তবে যুবকগণ * দ্রুত গতিতে বহুলোকের চোখের উপর দিয়া সরে পড়েন। তৃতীয় বারের চেষ্টায় দেশদ্রোহী ইংরাজের দালালকে বিপ্লবীরা অপসারণ করতে সক্ষম হয়। পুলিশের প্রতি ঘৃণা আর বিপ্লবীদের উপর শ্রদ্ধা এত বেড়ে গিয়েছিল যে কেউ পুলিশের পক্ষে সহযোগিতায় আসে নাই।

বাংলার গভর্ণর সাহেবও এবার বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বাংলার বিপ্লবীদল নির্মূল করে দেওয়া জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত দেন। কার্যতঃ সারা বাংলায় চরম অত্যাচার আরম্ভ হয়।

শলাকা

৩য় বর্ষ শারদীয় সংখ্যা—১৩৭৫

[পত্রিকাটি হাওড়া জেলার—১২ বেনারস রোড, সালখিয়া থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রভাস সাধুখাঁ। সম্পাদকমণ্ডলী—চিত্তব্রত মজুমদার, রবি রায়, ধীরেন সিংহ রায়।]

প্রবন্ধটি কিছুটা সংক্ষেপিত।

যুবকগণের মধ্যে (তিনবারই) সতীশ পাকড়াশীর ছিলেন। তাঁর গুলীতেই বসন্ত চ্যাটার্জি নিহত হয়।

দ্বিতীয় বারের আক্রমণে সতীশ পাকড়াশী বোমার টুকরোয় আহত হন। অপর সাথি আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। কিন্তু সতীশ পাকড়াশী আহত

হয়েও অসম্ভব মনের জোরে পালাতে সক্ষম হন। পর পর দুবারের ব্যর্থতায় বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয় কিন্তু সতীশ পাকড়াশীর আগ্রহে ও দৃঢ়তায় আবারি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এবার সতীশ পাকডাশী সফল হন। এ ঘটনায় বাংলার লাট পরে বলেছিনে: তিন তিনবার চেষ্টা করে দুর্ধর্ষ এনার্কিস্টবা একজন রাজকর্মচারীকে হত্যা করে যে একরোখামীর পরিচয় দিল তার যথোপযুক্ত প্রতিবিধান আবশ্যক।

বিপ্লবের সন্ধানে বিপ্লবীবন্দীরা

বর্তমান রাষ্ট্র ও ধনতান্ত্রিক সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে আমাদের সমাজতন্ত্রে পৌছতে হবে, এটা আজ সুস্পষ্ট। সমাজতন্ত্র থেকে ভবিষ্যতে কমিউনিজমের মহান উচ্চতর আদর্শে সমাজ গড়ে তোলার দিকে আমরা অগ্রসর হব। সমাজতন্ত্রের বুলি আজকাল ধনী-দরিদ্র শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের মুখে। কিন্তু একসময় ছিল যখন সমাজতন্ত্রের ক্ষীণ আলোর রেখাপাত মাত্র হয়েছিল কিছু সংখ্যক বিপ্লবীর মনে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কর্মীদের কাছে তখন দেশের ভবিষ্যৎ ও জনসাধারণের জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনার অবকাশ ছিল; গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছিল—বিপ্লবের লক্ষ্য কি? বিপ্লবের সাফল্য কোন পথে? নানারকম জিজ্ঞাসার জবাবে বিপ্লবীদের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডা হত—দলে ভাঙনও ধরত।

রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লব সেদিন এক নতুন দিনের বার্তা নিয়ে এসেছে—বিপ্লব কর্মীদের মনের দুয়ারে এক নূতন অলোকশিখা জ্বালিয়ে ধরেছে।

ভারত তখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শাসনে ও শোষণে ক্লিষ্ট, মুক্তি প্রয়াসের আলোড়ন উঠেছে দিকে দিকে। দেশের রাজা-জমিদার ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিকদের উপর ভিত্তি করে ইংরাজ শোষণের রাজত্ব কায়েম রেখেছে, মেহনতী মানুষের শেষ রক্তবিন্দুটুকুকেও শুষে নেবার চরিতার্থতায় অগ্রসর হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেশীয় ধনিক শ্রেণী ও জমিদারদের নাড়ীর টান। এরা একত্রে মিলেই সাধারণ মেহনতী জনগণকে শোষণ করে। কংগ্রেসের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার যতই বাড়তে থাকে, ইংরেজ সরকারের প্রভাব যতই কমতে থাকে, ধনী শিল্পপতিরা মুনাফার আশায় ততই বেশী করে কংগ্রেসের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কংগ্রেস নেতৃত্বও শিল্প মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের বিপুল অর্থ সম্পদের উপর নির্ভর করে স্বাধীনতা

সংগ্রাম জোরদার করে তোলেন। কংগ্রেস নেতা গান্ধী টাটা-বিড়লাদের সাহায্যপুষ্ট। এই পটভূমিকায় ১৯৩০ সালে সশস্ত্র বিপ্লবীদলের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তীব্র হয়ে উঠল। চট্টগ্রামে সরকারী অস্ত্রাগার তারা দখল করে নিলেন। সারা বাংলায় গুলি-বোমা চলল। ইংরেজ রাজকর্মচারী ও পুলিশ আক্রান্ত ও নিহত হলেন। বিপ্লবীরাও পুলিশের গুলিতে ও ফাঁসিতে জীবন দিলেন। একই সময়ে কংগ্রেসও সারা ভারতে আইন অমান্য আরম্ভ করে। তখনকার দিনের দুর্বল কমিউনিস্ট পার্টিও পুস্তিকা ছড়িয়ে রুশের সাম্যবাদী আদর্শে ভারতের গরীব সর্বহারাদের মুক্তিমন্ত্র প্রচার করতে থাকে। শোষণ-পীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা তখন উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তারা ইউনিয়নে সংগঠিত হচ্ছিল। ইংরেজ সরকার কঠোর দমননীতির দ্বারা জাতীয় আন্দোলন দমিয়ে দিতে লাগলেন। বেশী জোর জুলুম আরম্ভ হল সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের উপর। বহু লোক দণ্ডিত হয়ে কারাগারে ও দ্বীপান্তরে গেলেন। আর বহু লোক বাংলা দেশে ও বাইরের জেলে ও বন্দীশিবিরে আটক রাজবন্দী হয়ে রইলেন। বন্দীজীবনে তারা অনেক চিন্তা করার ও আলাপ আলোচনার সুযোগ পান।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮-৩৯ সাল অবধি দশ বৎসর সময় বিপ্লবী দলের বীর কর্মীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও তার পুরস্কারস্বরূপ বন্দী জীবন যাপন করে কাটালেন। এই দশ বছর তারা যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন, পরস্পর আলোচনা করেছেন এবং অতীত কর্মজীবনের সমীক্ষা করেছেন। তার ফলে তাদের চিন্তার মোড় ঘুরেছে। বিপ্লব পথের নূতন চিন্তার উন্মেষ হয়েছে।

২৫-৩০ বৎসর সশস্ত্র বিপ্লবের কল্পনা নিয়ে মধ্যবিত্ত বিপ্লব দলের কর্মীরা সন্ত্রাসবাদী কাজ চালিয়ে জেল-ফাঁসী-গুলি মাথায় পেতে নিয়েছেন। স্বাধীনতা আসেনি। এ-ভাবের সংগ্রামে সাফল্য লাভের সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

যুগ পরিবর্তিত হয়েছে। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ নূতন শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনগণ শোষণ-পীড়নে সর্বস্বান্ত হয়ে বাঁচার পথ খুঁজছেন। গান্ধীর পথ আপসের পথ, এ-পথে চললে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আসবে না। এবং নবোদ্ভূত পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠার পথ করে দিচ্ছেন গান্ধীজী ও কংগ্রেস। ইংরাজ রাজত্বের অবসান হলে এরাই মোড়লী করবেন রাষ্ট্র-

শাসনে, শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে এবং কৃষি পণ্য নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব, মুনাফা লুঠ ও জনগণের ভাগ্যনিয়ন্তা হবেন এরাই।

শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত ও কোটি কোটি মেহনতী জনগণের দুর্গত অবস্থা যে কে সেই থাকবে। শোষণ ও শাসন ক্ষমতা ধনীক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক রাজনীতিকদের করায়ত্ত হবে। জেলের নিভৃত কক্ষে এই সব সমস্যাসঙ্কুল চিন্তা দূরদর্শী বিপ্লবীদের মনকে সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন করে তো'লে। প্রথমে খুব কম লোকের মনেই এরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়। সব জিজ্ঞাসার উত্তর বোঝা তখন তাদের পক্ষে কঠিন ছিল।

কংগ্রেসী নেতাদের বক্তৃতায় জনকল্যাণ কামনার বাণী, তার উপর তাদের ব্যক্তিগত ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কারাবরণ সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। বিপ্লব দলের লোকেরাও তাতে বিভ্রান্ত হ'ন। শ্রেণী মনোভাব ও বুর্জোয়া-স্বভাব যে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত জঘন্য কত নীচ হতে পারে তা তখনো বোঝার ক্ষমতা ছিল না; অভিজ্ঞতা তো ছিলই না। যা'রা বুঝতে চেষ্টা করছেন তারা নিজেরাও তো পেটিবুর্জোয়া মানসিকতায় আচ্ছন্ন। কাজেই শ্রেণী বিপ্লবের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করা খুব কঠিন ছিল তখনকার দিনে।

ইতিহাসের গতিপথে এখন এটা সুস্পষ্ট যে এ প্রবাহমান দুনিয়ার অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতের গণসমষ্টিও ছুটে চলেছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুর্নিবার পথে—সমাজতন্ত্রের উন্নত লক্ষ্যে। অগণিত মেহনতী মানুষের মুক্তিসংগ্রাম প্রবাহ যে কোন "স্বার্থোদ্ধত অবিচার" রোধ করতে পারবে না; মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের তা বোধগম্য হয় নি। না হওয়াটা তখন বিস্ময়ের নয়। সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের ব্যর্থতায় সবে মাত্র তাদের গতানুগতিক বিশ্বাসের গোঁড়ামি ভাঙতে সুরু হয়েছে।

১৯৩০ সাল থেকে দশ বৎসরব্যাপী পড়াশুনা আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক ও ধ্যান-ধারণার পর সকল বিপ্লবী কর্মীই এক বা না একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

বিপ্লবীরা দেশের দুঃখ ও পরাধীনতার দাসত্ব মোচনের জন্যে বোমা-পিস্তল নিয়ে সংগ্রামের পথে বের হয়েছিলেন। সেদিন মৃত্যু ভয়ে তারা ভীত হন নাই। কেউ কেউ বন্দুকের গুলিতে বা বোমার আঘাতের চিহ্ন নিয়েই বন্দীশালায় এসেছেন। ফাঁসীর আদেশ মকুব করে কাউকে যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড দিয়ে আন্দামান দ্বীপ-চরে পাঠানো হয়েছে, বিশ-পনেরো বা দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগের শাস্তি দিয়ে অন্য সকলকে সাগর পরিবেষ্টিত আন্দামান জেলে পাঠিয়েছে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার। তাদের কত আশা ছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে, গেরিলা যুদ্ধ করে শত্রুকে মারবে, নিজেরাও মরবে। এই জীবন-মরণ সংগ্রামের রক্তাক্ত পথেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা। এখন দীর্ঘকালের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান জেলের বন্দীরা দেখলেন তাদের সকল আশা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ২৫-৩০ বৎসরের সংগ্রামের পরও তাদের চেষ্টা সফল হল না। আর এ-পথে সাফল্যের কোন লক্ষণও নেই।

শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরস্কার এই দীর্ঘকালের কারারুদ্ধ জীবন—ভারত মহাসাগর পরিবেষ্টিত আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন। যারা সংগ্রামের উদ্দীপনায় মত্ত হয়ে ছিলেন তারাই বন্দীশালায় এসে প্রথমটায় ম্রিয়মান হয়ে পরে নূতন চিন্তায় নূতন পথে বিপ্লবের জয়ের সাধনায় মগ্ন হলেন। বন্দীজীবন সার্থক করেছেন এরা বিপ্লব দর্শনের গবেষণায়, অতীতের সমীক্ষায় ও ভবিষ্যতের পথের সন্ধানে। কেবল আন্দামান জেলেই নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে এবং বক্সা, হিজলী, বহরমপুর ও রাজপুতনার দেউলী বন্দীশিবিরে শত শত রাজবন্দী এক সঙ্গে একই রকম সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত থেকে বন্দী হয়েছেন। সকলেরই সেই একই কথা, একই চিন্তা: কিছুই তো করা গেল না, এর পর কি হবে? বিপ্লবের লক্ষ্য কি, লক্ষ্যে পৌঁছুবার রাস্তা কি? ভারতের মানুষের মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির চাবিকাঠিটি কোথায় নিহিত আছে?

এই সকল তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতির চিন্তায় সর্বত্র বন্দীজীবনে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। নজরুলের ভাষায় বলা যায়: "কারার সারা দেহে মুক্তি ক্রন্দন।" এ ক্রন্দন প্রাচীর বেষ্টিত কার মুক্তির জন্য নয়। এ ক্রন্দন আরো বৃহৎ আরো মহান, মানব মুক্তি, ক্রন্দন, শোষণ শাসনের স্বেচ্ছাচারের কবল থেকে সাধারণ গণ মানবের মুক্তির ক্রন্দন।

এ ধ্যান-ধারণা অধ্যয়ন ও আলোচনার মাঝে বিপ্লবের লক্ষ্য ও বিপ্লবীর জীবনদর্শন বোঝার জন্য তারা আগ্রহশীল হয়েছিলেন। যে কারাগার শাস্তির আগার তাকে স্বদেশী আন্দোলনের বন্দীরা বিপ্লবী জীবন-জিজ্ঞাসার আলয়ে পরিণত করেন।

সংকীর্ণ জাতীয় বিপ্লব থেকে বৃহত্তর-উন্নততর আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সন্ধানে বন্দীশালায় বিপ্লবী শিক্ষায়তন (কলেজ) গড়ে উঠে। বন্দীরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার জন্য, জানা ও বোঝার জন্য পাঠচক্র (Study circle) তৈরী করেন।

ভারত মহাসাগরের বুকে "আন্দামান দ্বীপ"। ইংরাজ শাসক দেশের মানুষের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এখানে নির্বাসন দেয়। কিন্তু সাগর বুকের নির্মল হাওয়া বয়ে নিয়ে এসেছে বিশ্ব গণমানবের মুক্তিবিপ্লবের উদার বাণী বন্দীদের ক্ষুদ্র কারাকক্ষে। গভর্নমেণ্ট তাদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্তু পারে নি দেশের ও বিদেশের গণমুক্তি সংগ্রামের নূতন হাওযার আমেজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে। নব বসন্তের আমেজ যেমন প্রীতি দেয় মনে, রুশের সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতির খবরও তেমনি নূতন আলোকের অনুভূতিতে পুলক জাগায় তাহাদের অন্তরে।

ভারতের বিভিন্ন জেল থেকে বন্দী নেতারা সমাজতন্ত্র ও রুশের শ্রমিক বিপ্লবের বাণী নিয়ে এসেছিলেন আন্দামান জেলে। কলকাতার আলিপুর জেলে অসংখ্য গণ-বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা পড়েছিলেন "মেছুয়াবাজার বোমার মামলায়" শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা। কারারুদ্ধ কংগ্রেসী-সমাজবাদী ও ট্রেড ইউনিয়ন বন্দীদের সংস্পর্শে এসে অনেক কথা জেনে ও বই পড়ে এসেছেন আন্দামানের বন্দীরা। ঐ সকল মত ও পথ নিয়ে অগ্রণী বন্দী নেতাদের মধ্যে আলোচনা ও ভাব বিনিময় হল। পরে তারা ক্লাস করে কমিউনিজম ও মার্কসবাদী সাহিত্য পড়াশোনা আরম্ভ করেন। কিছু কিছু মার্কসবাদী সাহিত্যও সংগৃহীত হয়েছিল নানা কৌশলে, তা নিয়েই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পড়া ও আলোচনা চলতে থাকে। আমি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম, "আন্দামান জেলে ভারত মহাসাগরের দূর দিগন্তের পানে চেয়ে চেয়ে আমরা ভাবতাম। ভাবতাম অতীত দিনের সঙ্কীর্ণ অস্পষ্ট ধারণাগুলির কথা। আমার প্রথম জীবনে দেশের দুঃখ ও দাসত্ব মোচনের জন্য বোমা পিস্তল নিয়ে সংগ্রামের পথে বের হয়েছিলাম সেদিন 'মৃত্যুর গর্জন' শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতো।" 'দেশের দুঃখ মোচন' কথাটির কোন সংজ্ঞা ছিল না। মৃত্যু বরণ করারও কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। একজন বীরপণার রোমাঞ্চ দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, আর একজন হয়তো গভীর প্রেরণা ও মানবতার অনুরাগে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। একজন ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানেই সকল

দুঃখের অবসান হবে বলে মনে করতেন, অন্যজন মনে করতেন দেশের সকল লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ভিতর দুঃখ-মোচন নিহিত।

সুস্পষ্ট কোন আদর্শ না থাকায় বিভিন্ন বিপ্লবী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আদর্শের ছাঁচ তৈরী করে নিজেকে চালিত করতেন ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে, অবশ্য লড়াই করার প্রবল বাসনা সকলেরই ছিল। কিন্তু সে লড়াই কারা করবে? কাদের শক্তি সংহত করে আমরা বিজয়ী হব, কারা শেষ অবধি সংগ্রামের পথে অবিচলিত থাকবে—এ সকল প্রশ্ন আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা ভাবিনি।

কাজের আনন্দেই কাজ করে চলেছিলাম। জেলের দোতলা-তেতলায় বসে অদূরের ঐ সাগরতরঙ্গের সাথে আমাদের মনের বিপ্লব-তরঙ্গও দোলা খেত। স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কাদের বা কোন্ শ্রেণীর হাতে যাবে তাও ভাবি নি। ভেবেছিলাম শুধু স্বাধীনতা লাভ করলে সব দুঃখ অভাবের অবসান হয়ে যাবে। শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে সমাজের উপরতলার সঙ্গে নীচের তলার বিরোধ বাঁধবেই—তা না বুঝবার জন্যেই তো শ্রেণীসমন্বয়ের বুর্জোয়া নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলাম। শ্রেণীদ্বন্দ্ব, রুশের গণ্য প্লব, শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রে, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের অবসান, সাম্য, স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতা —কেমন যেন বাঁধ বাঁধ ঠেকত, আবার ভালও লাগত।

শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর প্রসার এদেশে অর্থনীতিক কাঠামোতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের যে নূতন পরিস্থিতি এসে পড়েছে, তাও বন্দীদের চিন্তায় স্থান পেল। তারা দেখে এসেছেন কলকাতা চটকল শ্রমিকদের স্ট্রাইক: কি বিপুল ঐক্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিল, ভীত গভর্নমেণ্ট কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র সৈন্য সমাবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। সাইমন কমিশন বয়কটের সময় ১৯২৮ সালে কি বিরাট শ্রমিক শোভাযাত্রা শোষণ ও শাসন-বিরোধী প্রতিবাদ পত্র সহ লাল পতাকা উত্তোলন করে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় আলোড়ন তুলেছিল। তারা ভাবলেন এই বিপুল ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শক্তিকে যদি বিপ্লবীভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তার কাছে মুষ্টিমেয় যুবকদলের সংগ্রাম শক্তি ম্লান হয়ে যাবে। ভারতের বিভিন্ন-স্থানের বড বড় 'স্ট্রাইকের' খবর আন্দামান জেলেও পৌঁছে যেত। এ অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী সাহিত্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসীয় মতবাদ ও বিপ্লবীদের চিন্তাস্রোত নূতন খাতে প্রবাহিত করতে লাগলেন।

শ্রেণী সংগ্রাম ও উদবৃত্ত মূল্য (সারপ্লাস ভেল্যু), ইতিহাসের বাস্তববাদী ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, সর্বোপরি সর্বহারাদের শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রলেতারিয়েত বিপ্লব—বন্দীদেব মনে বিপ্লব পথের নূতন আলো জ্বালিযে দিল। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তবাদের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার কথা পড়ে ও শিখে তারা ঐ বিপ্লবীভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। মনে হল এমন সুন্দর, এমন যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লব আর হতে পারে না। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের বই, রুশ বিপ্লবের ইতিহাস—কমিউনিজমের দর্শন, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও রাষ্ট্রবিপ্লব বন্দীমনের আমূল পরিবর্তন এনে দেয়, সে নূতনের স্রোতে মধ্যবিত্তদের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব-চিন্তা অনেকের মন থেকে মুছে যায়। তারা নূতন গণবিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ় সংকল্প নিলেন। সকল বন্দী শিবিরেই নূতন ভাবের আলোড়ন ওঠে। আন্দামান বন্দীশিবিরে শতকরা ৯৫ জন বন্দী ক্রমে ক্রমে কমিউনিজমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। অন্যত্রও প্রায় একই অবস্থা। তখন সমস্ত বিশ্ব জুড়েই একটা পরিবর্তনের যুগ এসে গেছিল, বিশেষ করে এশিয়া ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশসমূহে রুশ বিপ্লবের বিজয় বার্তা নবযুগের আহ্বান নিয়ে আসে। বাংলা ও ভারতের যুবশক্তি নূতনের ডাকে সাড়া দিলেন। কারাগার হল মুক্তি সংগ্রাম শিক্ষার আগার। সকল বন্দীরাই অবশ্য এ-মত গ্রহণ করেন নি। একটা মত ছিল ভারতের দর্শন, সমাজ, ধর্ম, ঐতিহ্য নিয়েই ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে। নিজ দেশের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানী করা মতবাদ এখানে দাঁড়াবে না।

তাদের মতে জাতীয়তাবাদের আদর্শই শ্রেষ্ঠ। জাতীয় স্বাধীনতাই কাম্য। অপর একটা মত ছিল—যাদের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রই গড়ে উঠল না, তাদের এখনই আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলা সাজে না। তারা বলতেন, শ্রমিক কৃষকদের সহযোগিতায় আগে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, তারপর নূতন পথের সন্ধান করা যাবে। তৃতীয় মত হল, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লবই এখনকার কাজ। তখনই রুশ বিপ্লবের মতো সর্বহারা বিপ্লবের চিন্তাই সকলের মাথায় ছিল, নূতন গণ-তন্ত্র বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা পরিস্ফুট হয়নি। রুশের সর্বহারা বিপ্লবের বিজয়োল্লাসে লেনিনের ১৯০৫ সালের বিপ্লবের লক্ষ্য ও কর্মসূচী লোকে ভুলে গেছিল। শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা তিনি

তখন বলেছিলেন রাশিয়ার তদানীন্তন রাষ্ট্র ও সামাজিক অবস্থায়। যাই হোক, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম—এই তিন মতের পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব চলছিল বন্দীমহলে। কমিউনিজম ও সর্বহারা বিপ্লবের উদীয়মান প্রভাব জেলের বিপ্লবী যুবকদের বেশী করে আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন বিপ্লব দলের নেতারা এ-নূতনের ডাকে প্রায় কেউই সাড়া দেয় নাই। তারা বুর্জোয়া মার্কা বিপ্লবী সমাজতন্ত্র অবধি যেতে প্রস্তুত, কিন্তু লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করেন নাই।

প্রথমে একটা দলের মধ্যেই কমিউনিজমপন্থী ও কমিউনিজম-বিরোধীদের দলাদলি চলে। পরে সকল বিপ্লবী গ্রুপেরই কিছু কিছু যুবক, দাদাদের বাধা অগ্রাহ্য করে কমিউনিস্ট মতবাদীদের দলে ভীড়ে পড়েন। কিছুদিন পরে আরো কয়েকজন, তারপর আরো কয়েকজন করে দল ভেঙ্গে নূতনের দিকে চলে আসতে লাগলেন। পরে আন্দামান জেলের বাঘা বাঘা বিপ্লবীরাও এ পথে ঝুঁকে পড়েন। নূতন যুগের বিপ্লবী চেতনার এ এক অপূর্ব জয়যাত্রা। পাঞ্জাব-বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবী বন্দীরাও কমিউনিজমের পথে এসেছেন। আন্দামানে সামান্য কিছু বন্দীই রয়ে গেলেন পুরানো গণ্ডির মধ্যে। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের মধ্যে নূতন বিপ্লব স্রোত বইতেছিল ত্রিশ দশকে—কেবল আন্দামানেই নয়, সর্বত্রই পুরানো আবর্জনাসঙ্কীর্ণ পথ পরিহার করে নূতন উন্নততর গণবিপ্লব প্রবাহ দুর্জয় বেগে ছুটে চলেছিল।

পরে বাংলা দেশের পার্টি থেকে গোপন ইঙ্গিত পেয়ে আন্দামান জেলের কমিউনিস্ট মতবাদীরা "কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে" যোগ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হলেন। এ সংহতির মধ্যে কমিউনিস্টদের জীবনযাত্রা প্রণালী নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হত। নূতন মতের উগ্রতা থাকে বেশী; একদল যুবক ব্যক্তিগত কোন কিছু রাখার বিরোধী হয়ে ওঠেন, জেলের সামান্য সম্পত্তি—নিজের নিজের কাপড়, জামা, জুতাও যৌথ সম্পত্তি করার কথা তোলেন তারা। অতীতে যে-বিপ্লবীরা ফাঁসীতে ও গুলিতে জীবন দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে শহীদ স্মৃতি দিবস পালন করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত ছিলেন, কারণ ঐ শহীদরা কমিউনিস্ট ছিলেন না।

কমিউনিজম আদর্শের প্রথম উচ্ছ্বাসে তারা মত্ত ছিলেন বলেই এমনটি হতে পেরেছে। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদী শিক্ষার দিকে সকলেরই অদম্য উৎসাহ ছিল। এ শিক্ষালাভের জন্য বন্দীদের কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে

হত। ১৯৩৬ সালের স্পেনের বিদ্রোহ ও বিপ্লবী সংগ্রাম বাংলার বন্দীদের চেতনায় নূতন স্পন্দন তোলে। ফ্যাসিবাদী ফ্রাঙ্কো সরকার বিদেশী সম্রাজ্য-বাদী ফ্যাসিস্তদের সহায়তায় সকল গণতান্ত্রিক দলের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতে থাকে। কত শত সহস্র প্রগতিবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মী, নেতা, মজুর, কৃষক, সাহিত্যিকদের হত্যা করে। গণতান্ত্রিক সংযুক্তফ্রন্টের বিপ্লবীরাও প্রাণপণ লড়াই করে ফ্যাসিস্ত শক্তিকে বিনষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত অস্ত্রসাহায্য আসে বিপ্লবের পক্ষে। অন্যান্য অনেক দেশের কবি, সাহিত্যিক অধ্যাপক ও কমিউনিস্টরা স্পেনের স্বাধীনতা সংগ্রামে—আন্তর্জাতিক বাহিনীতে (**International Brigade**) যোগ দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেন। ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক "রালফ ফক্স্" এবং "কড্ওয়েল" আন্তর্জাতিক বাহিনীতে স্পেনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুদ্ধে শত্রুর গুলিতে নিহত হয়ে শহীদ হয়েছেন। স্পেনের গণ-বিদ্রোহ ভারতে ও অন্য সকল দেশে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের চেতনা উদ্দীপিত করে।

প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতে কমিউনিস্ট মতের স্থান নাই বলে যে কথা উঠেছে পণ্ডিত মহলে, সেই সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে বাংলার মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের অধিকাংশের মনে কমিউনিস্ট মতবাদের বীজ উপ্ত হল। এমন সব মত তারা গ্রহণ করলেন তখন ভারতে একেবারে নূতন শিক্ষিত ব্যক্তিরাও যা গ্রহণ করতে পারেন নাই। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গ্রহণ, জাতীয়তাবাদ পরিহার, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব, বুর্জোয়া পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিলোপ ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা : কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে জনগণের মুক্তি বিপ্লবের সংকল্প নিলেন বন্দী অবস্থাতেই।

দশ বৎসরের বন্দীজীবনের শিক্ষায় বিরাট পরিবর্তন এল বন্দীদের চিন্তা মানসে। বিপ্লব পথের মোড় ঘুরে গেল গণমুক্তি সংগ্রামের আমূল পরিবর্তনের নূতন চেতনায়। এ সময়ে দেশের সাধারণ লোকের মনেও পরিবর্তনের আগ্রহ বাড়ছিল, দেশের বাস্তব অবস্থাই জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে পরিবর্তনের জন্য, নূতনের জন্য ব্যাকুল করে তোলে। রুশের বিপ্লব তাকে রূপ দেয়, পরিবর্তনের পথের নিশানা দেয়।

বিংশশতাব্দীতে লেনিন পরিচালিত গণবিপ্লবই সকল দেশের বিপ্লবের নির্দেশক শক্তি। বাংলায় বিপ্লবী বন্দিরা সেই পথেরই রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবের পক্ষ স্থির করলেন। তারা মুক্ত হয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন এবং

সারা বাংলার প্রতি জিলাতে জিলা কমিউনিস্ট পার্টি কমিটি গঠন করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখা বিস্তার লাভ করে সহরে-গ্রামে-ক্ষেতে-খামারে-কলে-কারখানায় ছাত্র ও যুবকদের মাঝে। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মহান বিপ্লব পথের সন্ধান পেয়ে গেলেন ইংরাজের জেলে, দ্বীপান্তরে ও বন্দীশিবিরে।

দেশহিতৈষী

শারদ সংখ্যা-১৩৭৪

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—সুধাংশু দাশগুপ্ত

দ্বীপান্তরের কারাকক্ষে নূতন আলো

...ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করার অপরাধে আমাদের প্রত্যেককে ভারী ছেঁচা লোহার বেড়ী পরিয়ে সিপাহী শান্ত্রীরা জাহাজে চড়িয়ে আমাদের সাগরের বুকে ভাসিয়ে দিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের বিপ্লবী আন্দোলন, বিপ্লবী সংগঠন, ও সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা কয়েক'শ মধ্যবিত্ত যুবক ও তরুণ কিশোর ভারতবর্ষ থেকে দ্বীপান্তরে বন্দী হয়ে এলেম দীর্ঘকালের কারাদণ্ডাজ্ঞাদেশ নিয়ে। স্বদেশের স্বজন বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ফাসীতে ও গুলিতে যারা জীবন দিয়েছেন সেই সব প্রিয় সাথীদের স্মৃতি লয়ে দ্বীপচরের অন্ধকার কারাকক্ষে নীরবে বসে চিন্তায় মগ্ন হলেম।

...নিজেদের কাজের দোষ ত্রুটির কথা কেহ কেহ ভাবলেন, কেহ বা নিজেদের অনৈক্য বিভেদের কথা ভাবলেন, আবার কারো মতে শত্রুকে দুর্জয় সাহসিক আক্রমণ না করাই আমাদের ব্যর্থতার কারণ। এ-ভাবে চিন্তা আলোচনায় কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর সকল বন্দীরাই পড়াশুনায় মন দিলেন। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী ইতিহাস পড়ে ও আলোচনা করে নিজেদের ভুল কোথায় তা বুঝার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

কারাজীবনের লাঞ্ছনা ও তার প্রতিকার চেষ্টাও চলছিল; পায়ে বেড়ী দেওয়া, বেত মারা ইত্যাদি জেল-কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের পর অনশন সংগ্রাম। ১৯৩৪-সালে দীর্ঘকাল অনশনের (**hunger strike**) সময় তিনজন রাজবন্দী মারা যান নির্যাতনের ফলে। ভারতব্যাপী আন্দোলনের পর আমাদের অমানুষিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়, কিন্তু তিনটি অমূল্য জীবন "কালাপানির" কালো জলে ডুবে গেল। মুক্তি-সংগ্রাম বিজয়ের দিনে বীর শহীদের বেদীমূলে এঁদের আত্মদান অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বইপত্র যা কিছু প্রকাশ্যে ও গোপনে সংগ্রহে করা গিয়েছিল তা নিয়ে সুরু হল ক্লাস, সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা। ভারতের বিভিন্ন জেল থেকে বন্দীরা

সমাজতন্ত্র ও রুশের শ্রমিক বিপ্লবের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। কারারুদ্ধ কংগ্রেসী, সমাজবাদী ও ট্রেড ইউনিয়ন বন্দীদের সংস্পর্শে এসে অনেকে অনেক কথা জেনে ও অনেক কাগজপত্র পড়ে এসেছেন। কেহ কেহ কিছু মার্কসিস্ট সাহিত্য নিয়েও এসেছেন। আন্দামান জেলে ভারত মহাসাগরের দূর দিগন্তের পানে চেয়ে আমরা ঐ সকল শুনতেম এবং ভাবতেম। ভাবতেম অতীত দিনের সংকীর্ণ ও অস্পষ্ট ধারণাগুলির কথা।... ..

সুস্পষ্ট কোন আদর্শ না থাকায় বিভিন্ন বিপ্লবী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আদর্শের ছাঁচ তৈরী করে নিজেকে চালিত করত। ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবল বাসনা সকলেরই ছিল, কিন্তু সে লড়াই কারা করবে, কাদের শক্তি সংহত করে আমরা বিজয়ী হব, কে বা কারা শেষ অবধি সংগ্রামের পথে অবিচালিত থাকবে?—এ সকল প্রশ্ন আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা ভাবি নাই। কাজের আনন্দেই কাজ করে চলেছিলাম। জেলে বসে অদূরের ঐ সাগর তরঙ্গের সঙ্গে আমাদের মনের বিপ্লব তরঙ্গও দোলা খেত। রুশের গণ-বিপ্লব, শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্ব, শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের অবসান, সাম্য স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতা, কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকত। আবার ভালও লাগত ...

ধীরে ধীরে চিন্তার মোড় ফিরল। কিছু সংখ্যক বন্দী সমাজতন্ত্রের সমর্থক হয়ে সন্ত্রাসবাদী পন্থা পরিহার করার কথা বললেন। অবশ্য অন্যেরা তাতে সায় দিলেন না।

আমাদের মধ্যবিত্তদের বিপ্লবী সংগ্রামের মতো সংগঠিত মজুরশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ 'স্ট্রাইক' করার শক্তি তুলনা করা, কলকাতা ও বোম্বাইয়ের কলকারখানায় হাজার হাজার মজুরের স্ট্রাইক, রাণীগঞ্জ ও ধানবাদের কয়লার খনির মজুরদের স্ট্রাইক, চা-বাগানের মজুরদের স্ট্রাইক—এতে শ্রমিক শক্তির দিকে আমাদের চিন্তা আকৃষ্ট হল। জেলে বসেই বড বড় স্ট্রাইকের খবর এবং স্ট্রাইক হলে গভর্ণমেণ্ট কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তার খবরও কিছু কিছু পেতাম। সংগঠিত মজুরশ্রেণীর, দুর্বার শক্তি সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হয়ে উঠলেম। এর সঙ্গে তুলনা করতেম সোভিয়েত রুশের শ্রমিক বিপ্লব জয়ের কথা।

১৯৩৬ সালে স্পেনের বিপ্লবী সংগ্রামের খবর আমরা সরকারী দৈনিক বুলেটিনে কিছু পেতাম। পুঁজিবাদী স্বেচ্ছাচারী ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগঠিত মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সকল মেহনতী মানুষের অপূর্ব বীরত্ব-ব্যঞ্জক সংগ্রাম দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যেতাম। দেশের সকল জনসাধারণের এত ঐক্য,

এত সংগ্রামী বীরপণা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল স্বেচ্ছাচারী-ফ্রাঙ্কো শাসনের অবসান করা গেল না। বিদেশী ফ্যাসিস্ত ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে ফ্রাঙ্কো সরকার পার পেয়েছেন, বিপ্লবীরা হাজারে হাজারে শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিলেন।

মজুরশ্রেণী ও সকল মেহনতি মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কঠোর লড়াই করেও ফ্রাঙ্কো শাসন উচ্ছেদ করতে না পারায় আন্দামানে আমরা বুঝলেম, আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম কত অকিঞ্চিৎকর। শ্রমিক-কৃষক ও সকল মেহনতী মানুষকে বাদ দিয়ে কোন বিপ্লবই এযুগে সফল করা যাবে না। কংগ্রেসী ভদ্রলোকেদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা একত্র হলেও ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তাছাড়া রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে সম্পত্তিপন্ন লোকেরা ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আপস করে আমাদের সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে। নূতন নূতন অস্ত্রের উদ্ভাবন, যান-বাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের উন্নতির ফলে রাষ্ট্রশক্তি এ-দিনে অনেক শক্তিশালী। শুধু আমাদের মধ্যবিত্ত যুবকদের সংগ্রামের দ্বারা ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তিকে টলানো যাবে না। রাজনীতি সচেতন শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হলে এবং তার সহিত গ্রামাঞ্চলের কৃষক শক্তি মিলে গেলে তবেই ইংরেজ শক্তিকে টলানো যায়— সমস্ত যান-বাহন, কলকারখানা, রেল-স্টীমার, ডক অচল করে দিতে পারে একমাত্র শ্রমিক কর্মীরাই।

ভারতের নবজাগ্রত গণশক্তিকে বাদ দিয়া শুধু মধ্যবিত্ত ভদ্র যুবকদের হাতে অস্ত্র দিলেই ইংরাজের শক্তিকে পর্যুদস্ত করার দিন আর নাই। গেল কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশ ও বিদেশের ইতিহাসের কত রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটে গেছে।··· তখন জেলে, বিভিন্ন বন্দীশিবিরে এবং বাইরের বিপ্লবী কর্মী মহলে আসন্ন পরিবর্তনের ধারা নিয়া তুমুল আলোচনা-বাদানুবাদ চলতে থাকে, আমরা দ্বীপান্তরে বসেও তার আঁচ পেতেম। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ও কমিউনিজম এই তিন রকম মতবাদই ছিল আলোচ্য বিষয়। এ নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপ বা খণ্ড-খণ্ড দল গড়ে ওঠে সর্বত্র। একদল জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐতিহ্য ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়া সমীচিন মনে করে না। সকলের আগে ইংরাজ শক্তিকে ভারত থেকে তাড়াতে হবে। দ্বিতীয় দলের লক্ষ্য সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শ্রমিকশ্রেণীকে সঙ্গে নিয়া সংগ্রাম করতে হবে এবং তাদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে,—এই

স্তাদের মত। তৃতীয় দল কমিউনিজমের আদর্শে শ্রমিক বিপ্লবেই বিপ্লবের সকল পরিণতি দেখে। শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা শোষক-শোষিতের সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে পারলেই জনগণের সুখ-শান্তি আসবে। আন্দামান জেলে এই তৃতীয় মতবাদীরাই প্রবল। শেষ অবধি শতকরা ৯০ জন বন্দী আন্দামানে 'কমিউনিস্ট কনসলিডেসনে' যোগ দিলেন।

…কমিউনিজম আর জাতীয় স্বাধীনতাপন্থীদের দলাদলি চলে এক দলের ভিতরেই, সকল বিপ্লবী গ্রুপেরই কিছু কিছু যুবক দাদাদের বাধা অগ্রাহ্য করে কমিউনিজম মতবাদীদের দলে ভীড়ে পড়লেন। কিছু দিন পরে আরো কয়েকজন, তারপর আরো কয়েকজন করে দল ভেঙ্গে নূতনের দিকে চলে এলেন। সর্বশেষে দাদারাও এ-দিকে চলে এলেন। বাঘা বাঘা বিপ্লবীরাও বাদ পড়লেন না। নূতন যুগের নব বিপ্লব চেতনার এ এক অপূর্ব জয়যাত্রা। আজ যে বিরোধী, কাল সে সহযোগী। পাঞ্জাব, বিহার ও উত্তর প্রদেশের বন্দীরাও সকলেই কমিউনিজমের পথে এসেছেন।

সামান্য কিছু বন্দীই রয়ে গেলেন পুরোনো গণ্ডির মধ্যে।…

পৃথিবী অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে, রাষ্ট্র-সমাজ চিন্তায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয়তাবাদ অনেক পিছনে ফেলে বিশ্বমানবের কল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদের চিন্তার আবির্ভাব হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রেণী পার্থক্য ও শ্রেণী শোষণের যুগ ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিয়ে মানুষে মানুষে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর নবযুগ আলো বিকিরিত করছে। মানব জাতির মুক্তির লক্ষ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। তবু আমাদের দুর্গত জীবনের অবসান হলো না। "দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ ?" পুরানো ময়চে পড়া সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ (ধনীকস্বার্থের বুর্জোয়া) সামন্তবাদ এখনো আমাদের দেশে প্রভাব বিস্তার করে আছে।

এ পঙ্কিল অবস্থার বিরুদ্ধেই আজ সকল মেহনতী জনগণের নূতন বিপ্লবের আহ্বান এসেছে ভারতে। আমি সে নব বিপ্লব প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাই। এই আমার আন্দামান দ্বীপের বন্দীশালার শিক্ষা।

বিংশ শতাব্দী

শারদ সংখ্যা .৩৭৩

[প্রবন্ধটি কিছুটা সংক্ষেপিত]

বিপ্লবের পথে

ইতিহাসের গতিপথে বিংশশতাব্দীর সাতষট্টি বৎসরকাল ধরে একটা পরিবর্ত্তনের, একটা নতুন জীবনের চেষ্টা এ-দেশে পরিস্ফুট। শতাব্দীর সুরু থেকে একটা নতুন অবস্থার জন্য আন্দোলন চলে এসেছে, এ আন্দোলনের বিরাম নাই, নিরবচ্ছিন্ন ধারায় গতানুগতিক জীবনের মোড় ফিরাবার প্রয়াসের অন্ত নাই। একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় সমাজচিত্তে আলোড়ন উপস্থিত। সুস্পষ্ট কিছু ধারণা না থাকলেও জাতীয় মুক্তিবিপ্লবের জন্যই যে আমাদের আন্দোলন ও সংগ্রাম তা সাধারণভাবে সকলেই বুঝেছিল। বিদেশী ইংরাজের শাসন ও শোষণ দেশবাসী মেনে নেবে না,—ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীও স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে চলে যাবে না। সুতরাং সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। এ সঙ্ঘর্ষের সাফল্যে যে স্বাধীনতার প্রত্যাশা তাকেই সে-দিনে বিপ্লব মনে করা হোত। স্বভাবতই এই জাতীয় মুক্তিবিপ্লব আকাঙ্ক্ষা এবং তার পরিণতি স্বরূপ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। বিজেতা ইংরাজ রাজ বিজিত ভারতবাসীর মুক্তি সংগ্রাম স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য অনেক বাধা দিয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন অত্যাচার চালিয়েছে—স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। ১৯৪৭ সালে ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়। ভারত স্বাধীন হল।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের আংশিক সমাধানে জাতীয় সমস্যার সমাধান হল না—দেশের লোক বুঝল আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। সামাজিক অর্থনীতিক বিপ্লব হয় নাই; সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয় নাই। অল্প দিনের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেল আমাদের রাষ্ট্রনীতিক বিপ্লবও হয় নাই; ইংরাজ আমলের স্বেচ্ছাচারিতা, আমলাতান্ত্রিকতা, ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেমনকে তেমনই রয়ে গেছে। বিদেশী সাদার বদলে দেশীয় কালো লোকের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র। লোকের অবিকশিত চেতনা, দেশের অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা,

জীবন যাত্রা নির্বাহের অসহনীয় ব্যবস্থায়, শিক্ষিত কর্মী মানসে নতুন জিজ্ঞাসার উদয় হয়, বিপ্লবের স্বরূপ বুঝবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসুক করে তোলে তাদের। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা বলার আগে প্রাক স্বাধীনতা যুগের আন্দোলনের পথে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বোঝা যাবে আমাদের জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতা কত গভীর ছিল। কি অবস্থা থেকে আমরা কোথায় উঠেছি। ভারতের অতীত ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার কল্পনা নিয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে পা বাড়িয়েছিলাম। বেদ, উপনিষদের ধর্ম আদর্শে ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব, অতীত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনব, 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' বাস্তবে চলছিল ইংরাজের দালাল, রাজা জমিদারদের কৃষক শোষণ। সেদিকে এদেশের নেতা ও কর্মীদের দৃষ্টি পড়ে নাই অতীতকে ফিরিয়ে আনার কথা দিয়েই তারা জনমন অধিকার করেছিলেন। ফিউডাল যুগের সংস্কারই তখন প্রবল। অতীত সভ্যতার গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যই স্বাধীনতা কাম্য। অতীতের দোহাই ছেড়ে দিয়ে বর্তমান ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি কি, এবং কি ধরনের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে ভাবতে তা রাজনীতিকদের চিন্তার বিষয় হল। ভারতের একটা আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য আছে, ত্যাগ বৈরাগ্য হবে আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্ত, পশ্চিমের মত শিল্প বাণিজ্য গড়ে তুলতে হবে ভারতে। মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি অহিন্দুদের সম্বন্ধে কোন কথা তখন জাতীয়তাবাদের মধ্যে স্থান পায় নাই। জমিদারবর্গ যে দেশের বিপুল কৃষক সমাজ উচ্ছন্ন করে দিল, যাদের জন্যেই ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজ বোঝাই করে নিচ্ছে সেই জমিদারের বিরুদ্ধে কোন কথা ওঠে নাই। নিজেদের স্বার্থে চিন্তাধারায় এমন দারিদ্র্য থাকলেও ইংরাজ রাজত্বের অধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের সংকল্পের দৃঢ়তা অবিচল ছিল। মধ্যবিত্তরাই সংগ্রামের অগ্রণী পাথক, সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই তারা শক্তি সংহত করছিলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবীরা সারাভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করার চেষ্টাও করেন। ইংরাজের শত্রু জার্মানী থেকে অনেক অস্ত্র সাহায্যও এসেছিল। ব্রহ্মদেশে সিঙ্গাপুরে, জাভায়, পারস্যে ও আফগানিস্তানে বিপ্লবীদলের কর্মীরা ঘাঁটি স্থাপন করে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। শিখসৈন্যরাও বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার কথা ঠিক করেছিল কিন্তু

ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বহু অস্ত্র ধরা পড়ে ও বহুবিপ্লবী বীর গ্রেপ্তার হয়ে ফাঁসীতে জীবন দেয়—পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে ছোট ছোট বিদ্রোহীদল এক একটা খণ্ড যুদ্ধ করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। বিপ্লবীদলের কার্যকলাপেও তখন একশ্রেণীর প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বিরোধিতা ছিল ; ভারত ধর্মের দেশ বুদ্ধ, নানক, চৈতন্যের দেশ, এ দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে না। বিপ্লবীরা পুস্তিকা বিতরণ করে তার জবাব দিতেন, 'ভারত শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, রণজিৎ সিংহের দেশ—তাঁতিয়াতোপী, রাণী লক্ষ্মীবাই প্রমুখ বীর বিদ্রোহীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দেশ'' ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন স্বাধীনতার জন্য। কোন বাধা তাদের গতিরোধ করতে পারে নাই। এ-সংগ্রাম পথে তারা দেশের লোকের প্রচুর সমর্থনও পেয়েছে। ভারতে সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র (**Federal Republic of India**) ঘোষণা করেই তারা ১৯১৫ সালে বিপ্লবী লড়ায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের জাতীয় আন্দোলন গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সারাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে গান্ধীর পরিচালিত কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গান্ধী দীর্ঘকাল কংগ্রেসের আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন। তিনিও জাতীয় আন্দোলনে ধর্মকেই প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি cultural religion সংস্কৃতিমূলক ধর্মের নাম দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বিধান করেন, ও হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। সশস্ত্র সংগ্রাম আন্দোলন তিনি ঘৃণা করতেন। গান্ধীর স্বাধীনতা হল সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা এতে শত্রুর হাতে মার খাওয়ার বিধান আছে—মার দেওয়া মহাপাপ। শ্রমিক কৃষকের স্বাধীন গণ-আনন্দোলনও তিনি বিরোধিতা করতেন। কংগ্রেসের অধীনে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর নীতি। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নিরুপোদ্রব গান্ধী আন্দোলনের প্রতি অনেকটা সহনশীল ছিলেন।

দেশের পুঁজিপতিরাও 'গান্ধীজী'র সাহায্যে এগিয়ে আসে। গান্ধীর কংগ্রেস-আন্দোলনকে টাটা বিড়লা ও অন্যান্য ধনিক শ্রেণীর লোক বহু অর্থ সাহায্য দিয়েছে, পুষ্ট ও শক্তিশালী করেছে। জমিদারেরা তাঁর আন্দোলনে

অংশগ্রহণ করেছে। গান্ধীও চৌরীচৌরা কৃষক বিদ্রোহ, বারদৌলীর কৃষক আন্দোলন, ও গোরক্ষপুরের কৃষকদের জঙ্গীপণার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করে কংগ্রেস থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন। শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর কবলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে পেশোয়ারের আন্দোলন যখন ব্যাপক জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই নিরস্ত্র জনতার উপর গাড়োয়ালী সৈন্যরা গুলি চালাতে অস্বীকার করেন। গান্ধীরই নির্দেশিত কংগ্রেস-আন্দোলনে যারা এগিয়ে এল তাদেরই গুলি করে হত্যা করতে অস্বীকার করায় গান্ধী সেই গাড়োয়ালী সৈন্যদের সামরিক আইন অমান্য করার অপরাধে অপরাধী বলে নিন্দা করেন। সামরিক আইনের (কোর্ট-মার্শেল) বিচারে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

১৯৩১ সালে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব—এই তিন পাঞ্জাবী বিপ্লবীর ফাঁসীর দিনে তিনি মৌন মিছিল বার করেন; কিন্তু বড়লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও ভারতের বা কংগ্রেস রাষ্ট্রনেতা গান্ধী ঐ তিনজনের ফাঁসী রোধ করার দাবি করেন নাই। অহিংসবাদী মহাত্মার হিংসাপন্থী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীর মুক্তি দাবি করতে বিবেকে বাধে বই কি? গান্ধী ও তাঁর প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলন ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ভারতের জাতীয় মুক্তিবিপ্লব আনয়নের কথাই বলতেন। ১৯৪৩ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম আগস্ট বিপ্লব নামে অভিহিত হয়। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' শপথ নিয়ে তিনি যে অহিংস সংগ্রাম ঘোষণা করেন পরে সে আন্দোলন সম্পূর্ণ সহিংস হয়ে যায়। স্বাধীনতা অর্জনের পথে ইংরাজ শাসনের উপর শেষ আঘাত হানল যে নৌ-বিদ্রোহ, জাতীয় নেতা গান্ধী জাতীয় গৌরব সে-বিদ্রোহীদের কাজকে গুণ্ডামী বলেছিলেন।

গান্ধীর প্রভাবে যেমন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্লাবন আসে আবার সেই আন্দোলন ও সংগ্রামের মাঝেই গান্ধীর পুরানো জাতীয়তাবাদী ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও আরম্ভ হয়। অবশ্য, দেশের বড় বড় পুঁজিপতি জমিদাররা গান্ধীনীতির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। সশস্ত্র বিপ্লব-পন্থীরা কিন্তু গান্ধীর অহিংসা ও পুঁজিবাদী শোষণনীতির বিরোধী ছিল। বড় বুর্জোয়াদের পরবর্তী স্তরের মাঝারী বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সহযোগী হয়ে গণতন্ত্রিক স্বাধীনতার দাবি তোলে। বড় বুর্জোয়া শ্রেণী

থেকে মাঝারী বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থেই বিচ্ছিন্ন হয়ে মধ্যবিত্তদের গণতান্ত্রিক জাতীয় বিপ্লবের সমর্থক হয়।

তৃতীয় একটি মত ও পথের চিন্তা জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের মাঝে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কলকারখানা প্রসারের ফলে এদেশে তার আনুষঙ্গিক শ্রমিকশ্রেণীরও উদ্ভব হয়। দেশী ও বিদেশী মালিক গোষ্ঠী মুনাফার লোভে শ্রমিকদের অতিরিক্ত খাটিয়ে এবং তার বিনিময়ে অতি অল্প মজুরী দিয়ে তাদের খেয়ে বেঁচে থাকার ন্যায্য দাবিটুকুও মেনে নিল না, তখন বিপুল সংখ্যক কলকারখানা, ডক, খনি ও রেলের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠন তৈরি করে মালিকদের বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষার আন্দোলনে ব্রতী হল। এই নবোদ্ভূত গণ-সমষ্টি প্রথমে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয়; কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ গণশক্তিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পরিচয় দিত। কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার দাবির সমর্থনে মালিকদের বিরুদ্ধে কিছু করতে ইচ্ছুক ছিল না। তা বুঝতে পেরে শ্রমিক সংগঠনগুলি নিজেদের সংগঠন ও আন্দোলনের উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীন শ্রমিক শক্তির অভ্যুদয়ে কংগ্রেস নেতা গান্ধী শ্রমিকের সংগঠন ও শ্রমিকের রাজনীতির প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন; শ্রমিক-কৃষক গণ-সংগঠনগুলি নিজের আওতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে তাতে ব্যর্থ হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মুনাফার প্রাচুর্যে ভারতে অনেক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কল কারখানাও বিস্তার লাভ করে, সুতরাং শ্রমিকের সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়ে যায়—একদিকে স্বেচ্ছাচারী শিল্প মালিকের শোষণ; অপরদিকে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রাম শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সেকালের ভূম্যাধিকারী ভূমিদাসের দেশে মালিক শ্রমিকের অভ্যুদয় এক নূতন পরিস্থিতি। মালিক শ্রমিকের উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বও দেখা দেয়;—এ দ্বন্দ্ব মুনাফা-লোভী ধনশক্তির সঙ্গে সর্বহারা গণশক্তির শ্রেণীদ্বন্দ্ব। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনী জনসমষ্টি অপরদিকে অসংখ্য গরীব গণসমষ্টি। ক্রমে এ দ্বন্দ্ব সারা ভারতে ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠে বাস্তব সংকটের কশাঘাতে মালিক শ্রমিক সম্পর্কের যে-বিরোধ উপস্থিত হল তার নীতিগত সমাধানের হদিস পাওয়া গেল রুশ

শ্রমিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে। রুশ বিপ্লবের প্রভাব এ-দেশের শ্রমিক ও সকল মেহনতী মানুষের মনে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার করে।

গান্ধী ছিলেন শ্রেণী-সমন্বয় নীতির সমর্থক, রুশ বিপ্লবের সময় থেকে শ্রেণী সংঘর্ষের নীতিই ভারতেও প্রবল হয়ে উঠে—রুশের শ্রমিক বিপ্লবের তত্ত্বগত পরিচালকশক্তি হল মার্কসবাদ। আমাদের দেশে শ্রমিক ছিল সমাজে অপাঙক্তেয়, অবজ্ঞাত ও ছোটলোক, কৃষকও তাই, অথচ প্রকৃত উৎপাদনকারী তারাই। শ্রমিকের জীবনদর্শন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞানোদয় হল মার্কসবাদী শিক্ষা থেকে। এবং রুশ বিপ্লবে শ্রমিকের অভাবনীয় অবদান দেখে।—আমাদের এ দেশেও শ্রমিক-শ্রেণী সচেতন ও সংগঠিত হয়। নিজেরাই নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। দেশের ভদ্রসমাজে শ্রমিকের মর্যাদাও ধীরে ধীরে স্বীকৃত হতে থাকে।

রুশ বিপ্লবের প্রভাব সামগ্রিকভাবে ভারতের সমাজ-মনসে এক নতুন জীবন দর্শন নিয়ে আসে। মার্কসবাদী তত্ত্ব ও বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদের আদর্শ প্রথমে সমাজের পরিবর্তন প্রয়াসী বিপ্লবী অগ্রগামী অংশকে স্পর্শ করে তারা এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সাড়া দেয়। এ-নতুনের নবারুণালোকে গান্ধীবাদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ম্লান হয়ে পড়ে।

প্রায় সত্তর বৎসর যাবৎ আমাদের জাতীয় আন্দোলন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসছে। এই স্বাভাবিক সংগ্রামরত আন্দোলন কখনো কখনো জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। সরকারী বাধা ও আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে কখনো কখনো মারমুখী বা বিদ্রোহোন্মুখ হয়ে উঠেছে। আজ অবধি আমাদের জাতীয় উন্নতি হয় নাই, জনগণের মুক্তিবিপ্লব সাধিত হয় নাই।

বিপ্লব হয় নাই—বিপ্লবই কাম্য। বিপ্লব-অভিমুখে চলার দীর্ঘপথে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ চেতনার অনেকটা স্ফুরণ হয়েছে। বিপ্লবের আশু লক্ষ্য ও স্বরূপও অনেকটা বোধগম্য হয়েছে। বিপ্লবী সংগ্রামের গঠন, ধরণ ও বিন্যাস ('ফর্ম, মুড ও অর্ডার') বুদ্ধির আয়ত্তে এসেছে। সকলের উপর বিপ্লবের অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট ও কল্পিত আদর্শ মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রগতির মাঝে সংগ্রামী অগ্র-বাহিনীর চেতনায় এখন কতকটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। জন-আন্দোলন, জনসংগঠন ও জনসংগ্রামের গতিপথে আমাদের চেতনা, বুদ্ধি ও সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ইংরাজ শাসকের আঘাতে দেশের সংগ্রামী শক্তি মজবুত হয়েছে।

আমরা বিপ্লব চাই। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবই ইতিহাসের অগ্রগতির জোয়ালো ইঞ্জিন। আমাদের গতিপথ বাধামুক্ত করার জন্য ও ত্বরান্বিত করার জন্য বিপ্লব প্রচেষ্টাই আমাদের চালক শক্তি। প্রথম যুগে আমরা রাষ্ট্র বিপ্লবের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। বিপ্লবের রোমান্স আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পাগল করে তুলেছিল। সশস্ত্র সংগ্রামী দলকে 'বিপ্লব দল' বলা হত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিপ্লবের গৌরব আছে বলে ইংরাজ সরকার ভারতের বিপ্লব দলকে এনার্কিস্ট দল বলে সকলের কাছে বিপ্লব দলের অখ্যাতি করত। 'এনার্কিস্ট'রা কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা মানে না—তারা একটা উচ্ছৃঙ্খল দল। ইংরাজ তা প্রতিপন্ন করার জন্যই বিপ্লব দলের নাম দেয় 'এনার্কিস্ট দল'। কিন্তু বিপ্লবীদের বিপ্লব-প্রচেষ্টা তাতে ব্যাহত হয় নাই। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অহিংস সংগ্রাম পথে গান্ধী ভারতে যে স্বরাজ আন্দোলন করেন ত'ও নাকি বিপ্লব আন্দোলন। জমিদার-পুঁজিবাদীদের নিয়ে শ্রেণী সমন্বয় ও সত্যাগ্রহের মহান নীতি দিয়ে কি মহান বিপ্লব হতো তা বোঝা কঠিন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কাণ্ডারী ছিলেন। শেষ অবধি তার অহিংস সত্যাগ্রহ-মন্ত্র ডুবে গেল আগস্ট বিপ্লবে ও নৌ-বিদ্রোহে এবং গান্ধীবাদ বিরোধী 'গণবিপ্লব'-পন্থী দলের উদ্ভবে। বুর্জোয়া স্বার্থে ভারত বিভাগে গান্ধীর স্বীকৃতিদানে তার অবসান হয়।

হাতে বোনা খদ্দর, কুটির শিল্প এবং অহিংস সত্যাগ্রহী সমাজ গড়ার কল্পনা নিয়ে ১৯২১ সালে গান্ধী স্বরাজ প্রতিষ্ঠার যে বিপ্লবী সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন ১৯৪৭ সালে ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর পুঁজিবাদী স্বাধীনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সে-বিপ্লবের পরিণতি হল। একেই বলে শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়া। বিপ্লব না এলেও বিপ্লব করার অদম্য ইচ্ছাই আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাবে। সংগ্রামের পথের অগ্রগতিই হবে বিপ্লবের মাপকাঠি। 'বিপ্লব' কথাটি বর্তমানের রাজনীতিতে প্রায় মুছে গেছে। বিপ্লব না হলে,—সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লবী রূপান্তর ঘটাতে না পারলে দেশ, সমাজ রসাতলে যাবে; মানুষের জীবন বিড়ম্বিত হবে। বিপ্লব চাই-ই। এ শতাব্দীতে দুটি দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে—রাশিয়া ও চীন-বিপ্লব। উভয় দেশেই মৃতপ্রায় সমাজ বিপ্লব সাধন করে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে; পৃথিবীর সকল দুর্গত শোষিত মানুষের কাছে আশা ও বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে ধরেছে। এদেশের মানুষের দুর্গত-জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে একমাত্র রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবের প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে আজকের দিনে

মেহনতী জনতার মিছিলে পাওয়ার আহ্বান এসেছে জনগণের কাছে। সে আহ্বানে সাড়া দিতে হবে।

বিপ্লব-জয়ই গণজীবনের জয়—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি, বিজ্ঞানের প্রসার ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী সবই নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদ ও **জাতীয়তাবাদ বিরোধী,** সমাজবাদী গণবিপ্লবের উপর। সক্রিয় গণ-সংগঠন, গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রাম বিপ্লব হাতিয়ার—এর শক্তি ও সাফল্যই বিপ্লবের মাপকাঠি। বিপ্লবের মহান লক্ষ্য পথের নিশানা ধরেই জাতীয়জীবনের চলার পথে উৎসাহের সঞ্চার হয়—উদ্যোগ আসে, কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। অর্জিত 'স্বাধীনতা' বিপ্লবের সূচনা মাত্র—'বিপ্লব' নয়। আমাদের স্বাধীনতা ধনী বুর্জোয়ার তথাকথিত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা—এখানে পুঁজিবাদী-শোষক-মালিক শ্রমিককে শোষণ করে মুনাফা লুঠ করে, জমিদার-জোতদার কৃষকের উৎপন্ন ফসলে ও খাদ্যশস্যে নিজেদের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করে। ব্যবসায়ী ও মহাজনরা কৃষক শোষণ করে মুনাফার পাহাড় তৈরি করে। এখানে বড় বুর্জোয়ার রাষ্ট্র শাসনে ও অর্থনীতিক শোষণে কোটি কোটি শ্রমিক, কর্মচারী, ও সকল মেহনতী জনের জীবন দুর্বিষহ। তার ফলে মালিক-শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রাম এদেশে তীব্রতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। জনগণের গণতন্ত্র এখানে নাই। সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক সাহায্যে এ-দেশের একচেটিয়া পুঁজিবাদ মাথা তুলে সগর্বে শোষণ দণ্ড নিয়ে দাঁড়াচ্ছে! বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ আর দেশীয় বৃহৎ পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের সহযোগিতায় ও চক্রান্তে আমাদের বড় বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। এরি জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এখানে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলছে শতাব্দীর প্রথম থেকেই। নিরবচ্ছিন্ন এই সংগ্রাম পথে লাঞ্ছনা, অত্যাচার-উৎপীড়ন অনেক সহ্য করতে হয়েছে। লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস, কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর দণ্ড, নির্বাসন, ফাঁসি, গুলিতে শত সহস্র দেশহিতৈষী কর্মী আহত ও নিহত হয়েছে। থানায় পুলিশ হেফাজতে আই-বি পুলিশের ঘাঁটিতে কত বিপ্লবীকে অমানুষিক শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মানুষ হত্যায় ইংরাজ রাজত্বের এতটুকু কুণ্ঠা ছিল না। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে চারদিক পরিবেষ্টিত একটি ছোট্ট ময়দানের সভায় সমবেত জনগণের মধ্যে এক হাজার নরনারী ও শিশুকে নির্বিবাদে কামানের গোলায় ধ্বংস করে দেয়। স্কুলের ছাত্রদের স্কুল-প্রাঙ্গণে ডেকে এনে মাস্টারদের সম্মুখে

মিলিটারীরা গুলি করে মেরেছে। কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের মেরেছে—গাঁয়ের কৃষকরাও যথেষ্ট মারধর অবমাননা সয়েছে। ছাঁটাই করে কত শ্রমিক ও কর্মচারীদের রুজি-রোজগার বন্ধ করেছে। কত পরিবার সর্বস্ব হারিয়েছে, কত পরিবার অনাথ হয়েছে। ইংরাজ-শাসন ভারতে শোষণ-অত্যাচারেরই শাসন।

এত অত্যাচারেও সংগ্রামী শক্তির গতিরোধ করতে পারে নাই বিদেশী শাসক-গোষ্ঠী; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে দেশের জনশক্তি দেশব্যাপী বিদ্রোহ স্বরু করার দিকে জোরের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বিপদ বুঝে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের সঙ্গে আপস করে ভারতের রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। বিনিময়ে অর্থনৈতিক শোষণের অধিকার আদায় করে নেয় ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এল। বিপ্লব প্রয়াসী জনগণের বিদ্রোহাত্মক অভিযানও শেষ হল। কিছু না পেয়েও দেশের মানুষ কিছু পেলাম মনে করে আত্মসন্তুষ্টিতে মগ্ন রইলেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক কার্য সমাধা হল।

জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনার মান নীচুস্তরে থাকায় তাদের সংগ্রামস্পৃহা শিথিল হল, সতর্কতা (**vigilance**) হ্রাস পেল। 'স্বাধীনতা তো পেয়েই গেছি' সুতরাং কংগ্রেস নেতারা আমাদের জন্য সবই করে দেবেন। দীর্ঘ বিশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে সাধারণ মেহনতী মানুষের চৈতন্যোদয় হল—কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতে সেই অকেজো গলিত পুঁজিবাদী সমাজই গড়ে তুলেছে। বিত্তসম্পদের মালিক মুনাফা লুট করে আরো ধনী হচ্ছে আর দেশের মেহনতী গণসমষ্টি,—শ্রমিক-কৃষক, কর্মচারী ও দরিদ্র জনগণ সর্বহারা হয়ে ভুখা মরছে।

ওদের মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি, মনে মুনাফার বিষ। আর এদের মুখে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি, মনে বিপ্লবের আগুন।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন মুক্ত হয়ে কংগ্রেস নেতারা ভারতে সাম্রাজ্যবাদেরই ভুক্ত বিশেষ সেই পুরানো জীর্ণ পুঁজিবাদই আমদানী করলেন। শোষণ, অত্যাচার, কঠোর নিষ্পেষণ নীতি, দারিদ্র্য, কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে দুর্বিবহ যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করে দিল। আমাদের 'স্বাধীনতা'র একি বিষময় পরিণতি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের সময় থেকে বিপ্লবের যাত্রাপথে অনেক বাধা ও ব্যর্থতার দুর্গম পথ বেয়ে নানা মত ও পথের গভীর দ্বন্দ্বের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার তীব্র লড়াই চালিয়ে, আমরা চলেছিলাম গণমানবের মুক্তি বিপ্লবের তীর্থযাত্রা পথে।

স্বাধীনতার লভ্যাংশ কি বিত্তবান পুঁজিপতিদেরই কুক্ষিগত থাকবে না তা সকল মানুষের সমান অধিকারভুক্ত হয়ে সমভাবে বিতরণ করা হবে?—স্বাধীনতা লাভের পর বিশবৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সাধারণ জনগণের বিশেষ করে সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারী কৃষক শ্রেণীর সংগ্রামী চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছে—তারা গণবিপ্লবের সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। বিপ্লবী পরিস্থিতি যতই ঘনিয়ে আসছে কর্মীর কতকাংশ নিষ্ক্রিয়তায় আনমনা হয়ে ততই সঠিক সংগ্রামী পথ পরিহার করে দক্ষিণ দিকের বিচ্যুতিতে ডুবে যাচ্ছে; আবার কিছু সংখ্যক কর্মী আগে চলার আগ্রহাতিশয্যে বাম বা অতিবাম দিকের বিচ্যুতিতে পড়ে সংগ্রামের না'মেই সংগ্রামকে বানচাল করছে। অন্যান্য দেশেও বিপ্লবী সংগ্রামপথে এমন দক্ষিণ-বাম বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু জয়ের পথ তারা বিলম্বিত করেছে মাত্র। মার্কসবাদী দর্শন ডায়েলেকটিকস্ ও রাজনীতি জানা এবং সকলের উপর সংগ্রামের অভিজ্ঞতা দিয়েই বিপ্লব সফল করে তোলা যায়, ; ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি এড়িয়ে চলা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অনেক দেশের মত মার্কসবাদী দর্শন, মার্কসবাদী চিন্তা আজ এ-দেশেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। অতীতে মার্কসবাদী চিন্তা মার্কসবাদী মত ও পথ ছিল আমাদের রাজনৈতিক নেতা ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট অখ্যাত ও অবজ্ঞাত, প্রগতিশীল জনগণের স্বাধীন সংগঠন, স্বাধীন সত্তা তারা পছন্দ করতেন না। প্রগতিপন্থীদের দর্শন মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দর্শন, আর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দর্শন শাসন-শোষণ ও কর্তৃত্ব রক্ষার আভিজাত্যের দর্শন। শোষিত দুর্গত জীবনের মোড় ঘুরাবার সংগ্রামের পথেই শ্রমজীবী জনগণ নূতন দর্শন—সমাজবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়। নিজেদের সংগ্রামী শক্তি দিয়েই তারা নতুন পরিবর্তিত বিপ্লবী দর্শন ও বিপ্লবী চেতনা উদ্বুদ্ধ করে এবং ক্রমে একে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ট্রেডইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ন্যায্য মজুরী ও অধিকার অর্জনের সংগ্রাম করতে করতে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে ওঠে। এবং মার্কসবাদী 'কমিউনিজম' আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী দল বিপ্লবী পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে। গেল বিশবৎসরে কংগ্রেসী শাসন ও শোষণে দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষ বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

বিপ্লব তাদের চাই-ই। শ্রমিক-কৃষকের জন্যই নয় শুধু সকল নরনারীর

স্বার্থে, দেশের ও জাতির স্বার্থে বিপ্লব একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিপ্লব পুঁজিবাদী বন্ধন থেকে উৎপাদিকা শক্তিগুলি মুক্ত করবে; ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সমষ্টিগত বা সামাজিক মালিকানায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত করবে। শোষণ ও শ্রেণী শাসন থেকে মানুষের বন্ধন মোচন হবে। 'ফিউডালিজম'-এর ব্যর্থতায় ক্যাপিটালিজম এসেছিল। 'ক্যাপিটালিজম' ব্যর্থ হয় নাই কেবল সমাজের মানুষকে নিঃস্ব সর্বহারা করে দিয়েছে, তাই 'সোস্যালিজম' না হলে মানুষ আর বাঁচে না—সমাজ উৎসন্ন হয়ে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদীরা যতই আস্ফালন করুক অন্তঃসারশূন্য ধ্বংসোন্মুখ এই ভড়ংটুকু আছে। সমাজবাদই আজ বিশ্ব বিজয়ের পথে। এই শতাব্দীতেই কত বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়েছে, জার্মান সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য, তুর্স্ক সাম্রাজ্য তলিয়ে গেছে। দুর্ধর্ষ হিটলার, চীনের রাষ্ট্রনেতা চিয়াং কাই-সেক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লব পৃথিবীর সকল দেশের নিপীড়িতজনের কাছে নতুন জীবনের উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে ধরেছে। কিউবা, কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম নিজ নিজ দেশে সমাজ বিপ্লব সুসম্পন্ন করেছে। কত পরাধীন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস, এডেন ও ফিলিপাইনে গেরিলা যুদ্ধ চলছে। দক্ষিণ আমেরিকার ছোট দেশগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেই চলেছে। বিশাল এশিয়া আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার পরাধীন দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র-নিরস্ত্র নানা ধরনের সংগ্রাম করছে। সমাজবাদের দিন সমাগত। প্রতিক্রিয়ার বিষদাঁত ভেঙে গেছে, থাবা মারার শক্তিও তার দুর্বল। পূর্বের ধারণা নিয়ে এর বিচার করা ভুল হবে। গণ-আন্দোলনের পথেই গণ-সংগঠন ও গণ-সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে উঠে, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠলে আর তার সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও মেহনতী জনগণ-সংযুক্ত হলে যে বিপুল শক্তির উৎস সঞ্চয় হবে তার কাছে প্রতিক্রিয়া শক্তির বাধা স্রোতের তৃণ-সম ভেসে যাবে। এ নতুন শক্তি উঠছে সমাজের তলা থেকে, এ-নতুন শক্তি উঠছে দুর্গত মানুষের জীবন-যৌবনের উৎস থেকে, এ নতুন শক্তি উঠছে শোষণ-পীড়ন বিরোধী বিক্ষুব্ধ মনের বিদ্রোহ থেকে; দেশের সমগ্র প্রকৃতিতেই আজ বিদ্রোহের সুর। বিপ্লবী কর্মীর গভীর দৃষ্টিতে তা স্পষ্ট অনুভূত হবে। বিপ্লবের শঙ্খধ্বনি আজ দিকে দিকে,—স্বদেশে ও বিদেশে।

গণতন্ত্রের শক্তি যেমন উঠে দাঁড়াচ্ছে, বাঁচার তাগিদে প্রতিক্রিয়ার স্বেচ্ছাতন্ত্র তেমন জোটবদ্ধ হচ্ছে মারণাস্ত্র নিয়ে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে স্বদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদী শক্তির এই জোট ঐক্যবদ্ধ গণ-অভ্যুত্থানের পথে প্রচণ্ড বাধা স্বরূপ;—বিপ্লবী-গণশক্তি ও প্রতিবিপ্লব ধনশক্তি আজ পরস্পর সম্মুখীন ; কেবল এ-দেশেই নয়, বিদেশেও অনুরূপ পরিস্থিত।

সংগ্রাম পথের পথিককে কঠিন বাধার পাহাড ডিঙিয়ে জীবনের জয় যাত্রা-পথের শেষে পৌছুতে হবে ; মুক্তিকামী জনগণের মুক্তিই প্রধান ও প্রথম কাম্য। বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়া বিপ্লব সাধন হবে না। সুতরাং বিপ্লবই লক্ষ্য। ইতিহাসের চলার পথে জনসমাজের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপ্লব অনিবার্য ও অপরিহার্য। সমাজের সঙ্কটজনক সমস্যার সমাধানের জন্য বিপ্লব প্রচেষ্টা ও বিপ্লবের উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা পবিত্র কর্তব্য। অবস্থা অনুকূল বিপ্লবীর হতাশার স্থান নাই।

নন্দন

আশ্বিন, ১৩৭৪।

আমার কয়েকটি কথা

বাংলাব রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিধাবা দেখে অনেকের মনে হয়েছিল, আমরা চলেছি কোথায়, কোন অতল গহ্বরে।

দুর্মূল্য, দারিদ্র্য, বেকারী, উচ্ছৃঙ্খলতা, খুন-জখম, রাহাজানী বোমার আক্রমণে শিক্ষা ধ্বংসপ্রায়; সাধাবণ লোকেব জীবন ও সম্পদ বিপন্ন। নকশালী ও পুলিশী সন্ত্রাস দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। এ সঙ্কটের মাঝে সমাজের উপবতলার মালিক ও সবকাব পরিচালকদেব নির্মম শোষণ ও মুনাফা লুঠ, এবং রুদ্রশাসন অব্যাহত আছে।

এই অবস্থার মাঝে কংগ্রেস ও তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি সকলে মিলে ধনী প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে একত্রে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে এক ঘবে কবাব সংকল্প ঘোষণা করেছে। পুলিশের একাংশ ও নকশাল প্রভৃতি হত্যাকারীবা ঐ শাসক ও মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির কাজে মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট দলনে তৎপর। "এবার মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট দলকে একঘরে কোণ ঠাঁসা করে রাখতেই হবে। তারা অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য, শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষকদের দাবি সমর্থন করে তাদের ক্ষেপাচ্ছে। সুতরাং এ দলকে বিচ্ছিন্ন করে নিধন করাই প্রকৃষ্ট কাজ।" রুশ, চীন, কিউবা ও আরো কতগুলি ছোট দেশেও এ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। এদের উদ্দেশ্য ভদ্রলোকের সমাজ নিষ্কণ্টক করতে হবে। নইলে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

এর প্রতিকারের জন্য চাই নির্বাচন। বাংলায় একটি প্রকৃত বামপন্থী সরকার গঠন করতে হবে। মার্কসিস্ট কমিউনিস্টরা এ দাবি সুরু থেকেই করেছেন। সকল কংগ্রেসগোষ্ঠী অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দল, প্রতিক্রিয়াশীল মালিক, ধনী, মহাজন ও জোতদার একত্রে আওয়াজ তুলে ছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বর্জন কর, নির্বাচন এখন নয়। খবরের কাগজে, রেডিওতে,

সংবাদী প্রচারপত্র সেই সুরে সুর মিলিয়েছে। মার্কসিস্টদের কোথাও স্থান নাই। "কুলীন বুর্জোয়া সমাজে" তাদের স্থান নাই।

উপরতলার মানুষ হলেন সভ্য, কুলীন। তারা ছোট বড সকলে মিলে শতকরা মাত্র দশজন বৈ তো নয়। তবে তাদের হাতে আছে রাষ্ট্রক্ষমতা কলকারখানা, ধনসম্পদ, সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনী, জেল, বিচারালয়ে তাদেরই একতিয়ার। আর নীচের তলার অকুলীনরা সংখ্যায় নব্বই জন হলেও তারাইতো সর্বহারা, শুধু খেটে মরে। এই সর্বহারাদের বেদনার তন্ত্রীতে স্পন্দন তুলেছে মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা, তারা তাদের সাথী-বন্ধু ও পরিচালক। বাংলার মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা তাদের শ্রেণীস্বার্থের পিছু টান মুছে ফেলে দিয়ে শ্রমিক-কৃষকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সমপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। মেহনতী মানুষরাই সমাজের মূল ভিত্তি, তারাই উৎপাদন করে, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাঁরাই ভবিষ্যতের রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করবে।

শোষিত শ্রেণীর কোটি কোটি জনগণ শোষক শ্রেণীর শাসন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। দুই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মার্কসিস্ট কমিউনিস্টরা সকল মেহনতী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সকলের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীন সুখী জীবন গড়ে তুলবেন। রাষ্ট্র ও সমাজ নেতৃত্বও শ্রমজীবী গণশ্রেণী নিজ হাতে তুলে নেবেন। মার্কসিস্ট কমিউনিস্টরা শোষিত জনগণের সংগ্রাম পরিচালনা করছেন এবং এই মূল লক্ষ্যে পৌছবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

কংগ্রেস গোষ্ঠীগুলি ও আট পার্টির তথাকথিত বামপন্থীরা মার্কসিস্ট কমিউনিস্টদের কোণঠাসা করতে পারবে না। বিচ্ছিন্ন হবেন আপনারাই। বুর্জোয়া দেমাক, রাষ্ট্রে বুর্জোয়া প্রাধান্য নিয়ে আপনারা সবাই ডুববেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আপনারা বেঁচে থাকবেন অতীতের কঙ্কাল হিসেবে।

আপনাদের প্রতি আমি কোন ঈর্ষা পোষণ করি না। আমি বৃদ্ধ, আমার দীর্ঘ ৬০ বৎসরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের শিক্ষা এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি বলছি। জনগণ থেকে মার্কসিস্ট কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে আপনারাই দেশের অগণিত কর্মী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কোন সন্দেহ নেই শেষ অবধি মার্কসিস্ট

কমিউনিস্টরা জয়ী হচ্ছেন। এদের বাদ দিয়ে কোন গভর্নমেণ্টই বাংলা দেশে হতেই পারে না।

ধনী-দরিদ্র ও শ্রমিক মালিকের শ্রেণীদ্বন্দ্বে আপনাদের স্থান কোথায়? দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত রাজনীতিকরা ভেবে দেখেছেন কি? এ যুগের সমাজ চলেছে কোনদিকে? গণ-বিপ্লবের হাওয়া আপনাদের দেহ-মন স্পর্শ করে নাই কি? আপনারা তো অনেকেই আমার জেলের সাথী, বাহিরের সাথী ও বন্ধু এবং পরিচিত। আপনারা কেহ কেহ বা জেলে বসে মার্কসবাদ পড়েছেন এবং তাতে আকৃষ্টও হয়েছিলেন। পরে আবার তা ভুলে গেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে আজকালকার কর্মী অনেকেই আমার জুনিয়র। ১৯১১ সালে আমি প্রথম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই এবং সে যুগের জেলের প্রচণ্ড অত্যাচারের ভিতর দিয়ে ১৯৬৮ সাল অবধি বার বার কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করেছি। এবং আপনাদের কারুর সঙ্গে দ্বীপান্তরে ও ভারতের কারাগারে সহবাস করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন আগামী দিনের গণ-বিপ্লবের ধ্বনি শুনুন "আমরা কোন জোটেই নেই"—এই নীতি নিয়ে আর. এস. পি, আট পার্টি বা বিভিন্ন কংগ্রেসী জোটের বালির বাঁধ বেঁধে নতুন জীবনের জোয়ারকে ঠেকাবার বৃথা চেষ্টা করছেন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে, সত্যিকার কমিউনিজমপন্থী পার্টিকে কেউ রুখতে পারবে না। তারাই বিপুল গণশক্তির নেতা হয়ে এগিয়ে যাবেই। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে তাদের কতক কতক কর্মী ও নেতাকে আপনারা বিলোপ করে দিতে পারেন তবু সকল রাস্তাই আজ গণ-বিপ্লব জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। নতুন জীবন, নতুন সমাজ এবং নতুন রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলবে যারা তাদের সাথে সাথী হয়ে স্রোতের অনুকূলে চলুন।

নকশাল পন্থী যুবকরা বিপ্লবের নামে প্রতিবিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। মেহনতী মানুষের শ্রেণীর সংগঠন ও শ্রেণীর সংগ্রাম ব্যতীত যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করে ও মার-কাট করে বিপ্লব হবে না। মার্কসবাদ ও মাওবাদ কোথাও নকশালী কর্মপদ্ধতির সমর্থন করে নাই। হতাশ মনের উদ্দাম কার্যকলাপ একটা ভীতিব্যঞ্জক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে পারে না। শত্রুদের সাহায্যই করছেন আপনারা।

গণ-জাগরণ, গণ-সংগঠন ও গণসংগ্রামের জোয়ার দেখে মধ্যবিত্ত

রাজনৈতিকরা একত্রে মিলে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস বিরোধিতাও পরিত্যাগ করেছিল। সি. পি. আই. দলের এক বড় নেতা তো বলেছিলেন : "কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতি বর্তমানে অচল।" অর্থাৎ শোষিত গণশক্তির অভ্যুত্থান ধনিক শক্তি (বুর্জোয়া শক্তি) জোটবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ও গণ শ্রেণীর প্রতিনিধি কমিউনিস্ট মার্কসিস্ট পার্টিকে কোণঠাসা করার নীতি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের পতাকা তলে এসে ভীড় করে। একটু অনুধাবন করলেই তারা বুঝবেন 'মোরারজী & পাতিল কোং'-এর সাথে ইন্দিরা-কংগ্রেসের মূলগত কোন প্রভেদ নেই। সকলেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শক্ত ঠ্যাংয়ের তলে আশ্রয় নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন।

শোষক ও শোষিত দুই শ্রেণীর মানুষ পরস্পর সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিস্ট মার্কসিস্টরা বিপ্লবী তত্ত্ব ও বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে, আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের কাছে এ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা অপ্রত্যাশিত নয়। তাছাড়া পার্টির ছোট ও বড় নেতাদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, বিপ্লবী কর্মসাধনা, মজুর, কৃষক ও মেহনতী জনগণের মধ্যে দীর্ঘকাল কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা সাধারণ লোকের কাছে তাদের আদৃত করে তুলেছে। সকল সংগ্রাম পথেই এই পার্টির নেতা ও কর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী তারা চলবেন। নির্বাচনেও তাই তাদেরই বিপুলভাবে ভোট দিয়েছেন অগণিত মেহনতী মানুষ। জয় তাদেরই, জয় শ্রমিক কৃষক জনগণেরই।

বুঝে নেওয়া দরকার ভারতবর্ষ কোন লক্ষ্যে, কোন পথে কোটি কোটি মানবের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারবে। একটা ধনতন্ত্রের পথ, অপরটা সমাজতন্ত্রের পথ। একটা মুষ্টিমেয় ধনিক মালিকদের আধিপত্য, অপরটায় অগণিত সাধারণ মানুষের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার। কমিউনিস্ট মার্কসিস্টদের পার্টিই সব কিছু অর্জন করবে। আজ যারা সর্বহারা, কাল তারা সর্বজয়ী। এই মূল কথাটি সকলকে এ বৃদ্ধ, বুঝে দেখার ও ভেবে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছে।

গণশক্তি

১২ই মার্চ ১৯৭১

সম্পাদক—সরোজ মুখোপাধ্যায়

[১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত]

সাম্প্রদায়িকতার অবসান কোথায়

এ প্রবাহমান সংসারে কত রকমের ভাবপ্রবাহই যে আমাদেব সমাজ-মানসে দোলা দিয়ে যায়, কত বিচিত্র ধারায় আমাদের কায়িক ও মানসিক আলোড়ন ওঠে, আবাব উবে যায়। প্রাকৃতিক জগতের মতোই মানুষের মনোজগৎ —কথনো শান্ত-স্থিব, কথনো বা দুর্মদ-অস্থির। ঝড ওঠে, মনে হয় সব বুঝি গেল ; যায়ও অনেক কিছু ধ্বসে। আবাব প্রকৃতি শান্ত হয়। ভাঙ্গা আশা আবাব জোড়া লাগে, আবার নূতন জীবন আবম্ভ হয়।

মানুষেব সাথে মানুষেব ঐক্য ও সম্প্রীতিটাই স্বাভাবিক, কিছু ভাটার টানে সময় সময় ঐক্যবদ্ধ জীবনের জোয়াব স্তব্ধ হয়ে যায়। ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায় মানবতাবোধ, প্রীতি-সৌহার্দ্যের সম্পর্ক সম্মিলিত জীবনের প্রচেষ্টা। মানুষ অমানুষ হয়ে যায় ধর্মেব নামে, সাম্প্রদায়িকতাব নামে, কথনো বা উগ্র জাতীয়তার নামে। আদিমযুগের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো প্রবল হয়ে দাঁড়ায়, ও ন্যায়বুদ্ধি মুছে যায় মন থেকে, বিলুপ্ত হয়ে যায় মানবিক চেতনা ও তার স্ফোটন প্রয়াস। মধ্যযুগীয় মতান্ধতা এই বৈজ্ঞানিক যুগেও মানুষকে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উন্মত্ত কবে তোলে।

বর্তমানে এমনি দুর্বল মানসিকতা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অতি বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মেতে গেছে সমাজের একটা বড অংশ। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধবিশ্বাসে মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত পশুত্ব মাথা চাডা দিয়ে উঠেছে। হিউম্যান ভ্যালুস্—মানবিক মূল্যবোধের যেন অবসান হয়ে গেছে। যেন আবার আমবা আদিম ও মধ্যযুগে ফিরে গেছি।

…এক ধরনের উচ্ছ্বাস মানুষকে সংকীর্ণ স্বার্থের পঙ্কিলতায় ডুবায়, ভেদবিভেদের ঈর্ষা-দ্বেষে পশুত্বে পরিণত করে, মানবিক মূল্যবোধ ধূলায় লুণ্ঠিত করে। হতাশা ও নৈরাশ্যে এর শেষ পরিণতি। অপর ধরনের উচ্ছ্বাস মানুষকে উদার মানবতার দিকে বিকশিত করে নিয়ে যায়, গণতান্ত্রিক চেতনায় ও কর্মে উদ্বুদ্ধ

করে ঐক্য ও মিলনের মহানুভবতায় সম্পৃক্ত করে। মানুষের মন চায় প্রকৃত মূল্যায়ণের মাঝে জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠুক, এগিয়ে চলুক প্রবাহমান পথে আগামী দিনের সম্মিলিত জীবনের উজ্জ্বল প্রভাতের পানে। এই কাম্য লাভের জন্যই তো সংগ্রামী প্রেরণা যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিরাজমান।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষ মজ্জাগত হয়ে আছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ নিজের স্বার্থে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হওয়ায় সাহায্য করেছে—একে পুষ্ট করে বিভেদের ভিত্তি রচনা করে ওরই উপর তাদের শাসন ও শোষণ কায়েম রেখেছে। এটি সত্য যে ভেদ-বিভেদের দ্বারাই ইংরেজ এখানে তিষ্ঠে ছিল। নইলে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ও সংগ্রামে ভাবতে ইংরেজ শাসন আরো আগেই হয়তো শেষ হয়ে যেত।

এতো বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলিত দিনের কথা। স্বাধীনতা লাভের ষোলবছর পরেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ রয়ে গেল কেন? বাংলাদেশব্যাপী খুন-জখম, আগুন ও লুঠতরাজের সন্ত্রাসের মধ্যে আজ আমাদের এ প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। এত গণতান্ত্রিকতার বাণী, এত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দোহাই সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক বর্বরতা আজও সমাজ মন কলুষিত করে রেখেছে কেন? ইংরাজ শাসন তার ভেদনীতি নিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তবু স্বাধীন "জনকল্যাণ রাষ্ট্রে" এমন অকল্যাণ কেন?—এ দুর্গতির অবসান করতে হলে এর কারণ খুঁজে বার করতে হবে অতীতে ইউরোপীয় দেশে খৃষ্টান-ইহুদি দাঙ্গায় কত ইহুদী জীবন দিয়েছে। জার্মনীর হিটলার ইহুদি নির্মূল করার ব্রতে লক্ষ লক্ষ ইহুদী নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমেরিকায় ও ইউরোপে সাদায়-কালোয় বিরোধ এখনও আছে। ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক অতীত হয়ে যাওয়ার পরও যথাপূর্বং তথা পরং। ভাববার বিষয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা সাদায়-কালোয় বিরোধ একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। সেখানে সমাজের সকলে মিলে উন্নত সুখী জীবনের পথে পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

এবার কলকাতায় ও অন্যান্য জিলায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারী শিশু-বৃদ্ধ আহত ও নিহত হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি বিত্তসম্পদ বিধ্বস্ত হয়েছে। কত বাড়ি, কত বস্তি, কত গ্রাম আগুনে

পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। হাজার-হাজার লোক আশ্রয়হীন হয়ে পথে বসেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে—লুঠ হয়েছে। ভায়ের রক্তে ভাইয়ের হাত রঞ্জিত হয়েছে। যারা শান্তির দিনে একত্রে বসবাস করেছে, আজ দুর্যোগের দিনে তারাই একে অন্যের বুকে ছুরি বসিয়েছে। পরোপকারী অমায়িক ব্যক্তি হোক, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সমর্থক হোক না কেন—মুসলমান হওয়াটাই তাকে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট। এমন নিষ্ঠুরতা-এমন বীভৎস ভাব কলুষিত গুণ্ডামী রোধ করবে কে?—শাসনের দণ্ড যাদের হাতে তারাও তো সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুক্ত নন। তাহলে অসহায়রা দাঁড়াবে কার দুয়ারে। (অবশ্যই পরে মিলিটারী শাসনে গুণ্ডামী স্তব্ধ হয়ে যায়) নৌসের আলি সাহেব, এম-পি-কে কে না জানে, পূর্বে তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রীও ছিলেন, তাঁর সুশিক্ষিত পরিবারের খ্যাতি সুবিদিত। এ পরিবারটিও আক্রমণোদ্যত গুণ্ডাদলের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে এক হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অথচ ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মুসলমানরাই হিন্দু ঘেঁসা কংগ্রেসী বলে নৌসের আলি সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করেছিল। এমন বহু লোক আছেন যারা সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক হিন্দু প্রফেসার মুসলমানদের সাহায্য করার অপরাধে হিন্দু যুবকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। জীবন বিপন্ন করেও কিছু কিছু লোক সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দিয়েছেন। সকলেই নীচুস্তরে নেমে যায় নাই সত্য, কিন্তু সক্রিয়ভাবে গুণ্ডামীর বাধা দিতেও সাহস পায় নি। আবার অনেকে আছেন যারা নিষ্ক্রিয় থাকলেও গুণ্ডামী ও অত্যাচারের তারিফ করেছেন,—পাকিস্তানের হত্যাকাণ্ডের জবাব হচ্ছে ভেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছেন। বুঝেন না তারা, যে গুণ্ডামী দিয়ে গুণ্ডামী প্রতিহত করা যায় না, খুলনার বদলা নিয়াছে কলকাতা, পাকিস্তানের লোকেরা আবার আরো জোরের সঙ্গে তার বদলা নিয়েছে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে।

কেন এ হত্যালীলা—কেন এ জিঘাংসা? কেন এ সমাজবিরোধী মনুষ্যত্ববর্জিত নৃশংস তাণ্ডব?—কবে এবং কিসে এর অবসান?—উত্তর বোধহয় অহিংস-সহিংস ব্যক্তিদের প্রত্যেকেরই অজানা। একটা সাম্প্রদায়িক বিষের উত্তাল জোয়ারের টানে প্রত্যেকেই গা ভাসিয়ে দিয়েছে, এর ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা না ভেবেই।

খুলনা হত্যাকাণ্ডের বদলা হিসাবেই পশ্চিমবঙ্গে এবার এমন অঘটন ঘটল

তা বলা ঠিক হবে না। খুলনা ঘটনার খবর এখানে গোলমালের আশু কারণ হতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব তো লোকের পূর্ব থেকেই মনে গাঁথা আছে। মাঝে মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবান মালিকরা তার উসকানিও দিয়েছে; জব্বলপুরের সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন, হত্যা ও ঘর জ্বালানোর বর্বরতায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বিচলিত হয়েছিলেন। গোরক্ষপুর ও বিহারেও বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক আক্রমণ চলেছে। তখন তো খুলনা বা পাকিস্তানের অন্য কোথাও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের উত্তেজক কারণ ছিল না—তবু তো নির্বিচারে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ চলেছিল।

ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা একটি সামাজিক ব্যাধি। নূতন যুগের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক প্রভাব এ দেশে তেমন নাই বলে আমরা এখনো অতীত সামন্ত যুগেই পড়ে আছি।

বর্তমানের চরম দারিদ্র্য ও নির্মম শোষণপীড়িত গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত এ-দেশের জনমানসে সামন্তযুগের কর্দম দিকটাই এখনো বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাই ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীতে দেশের লোকের মন আচ্ছন্ন, আর তা নিয়েই যত বিরোধ-হানাহানি।

এ ব্যাধি নিরাময় করতে হলে চাই আমাদের চিন্তা বুদ্ধি ও কর্মধারার আমূল পরিবর্তন। শুধু মন ভাল করার চেষ্টা করলেই মন ভালো হয়ে যাবে না। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিলে গাছকে ফলে-ফুলে পরিপুষ্ট করে তোলা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার উৎস কোথায় কারণগুলি জেনে বুঝে তার বিষাক্ত বীজ উচ্ছেদ করার দিকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনধারা পরিচালিত করার কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করলেই সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা মন থেকে দূর হয়ে যাবে। মানবিক উদারতা আমাদের কাজে ও চিন্তায় পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। যে ছাত্র, যুব ও শ্রমিক কর্মচারীগণ এবার দাঙ্গায় রীতিমত অংশগ্রহণ করেছে—সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের দলে যোগ দিয়ে সকল রকম অপকর্ম করেছে,—তাদের ভ্রান্ত মনোভাবেরও শোধন এবং পরিবর্তন হবে।

পূর্ববঙ্গ হতে সকল হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে টেনে নিয়ে এলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, যারা এরকম মনে করেন তাদের ভেবে দেখা উচিৎ যে লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গবাসীদের ঘর-বাড়ি-জমি-কাজ কারবার ও জীবিকানির্বাহের সকল উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ডেকে এনে এদেশে তাদের স্থান দেওয়া সম্ভব হবে কিনা; আমাদের গভর্নমেন্ট তো পূর্ববর্তী রিফিউজীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা

করতে পারেনি। তার উপর আবার লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের নূতন করে এদেশে আনা হলে পাকিস্তান থেকে তাদের বাসস্থানের উপযোগী জায়গা ফিরিয়ে দেবার দাবিও উঠবে বা উঠছে। বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভাব্য বলে মনে হয়না। এ অবস্থায় পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হিন্দুরা এদেশে এসে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো অসহায় হয়ে শুকিয়ে মরবে। তাদের জন্য কাজ-কারবার, রুজি-রোজগার ও বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা, এক কথায় সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে কে?

তার চেয়ে পাকিস্তানেই যাতে তারা মানুষের অধিকার পেয়ে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে, অপর সকলের সঙ্গে একত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারে, আর এদেশের মুসলমানরাও যাতে অনুরূপ ব্যবহার পায়, আমাদের নেতৃবর্গের ও সরকারের তা করার কার্যকরী উপায় বার করাই সঠিক কাজ হবে। উভয় দেশের স্বাধীনতালাভের ষোল বছর পরেও পাকিস্তানের জনসংখ্যার হিন্দু অংশকে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা অবাস্তব কল্পনা মাত্র। এতে কোন দেশেরই কল্যাণ হবে না।

একমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সংগঠন ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রামের দ্বারাই মানুষে মানুষে ঐক্য স্থাপন ও সম্প্রীতি সম্ভব হবে। এবং সমাজের সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্র তৈরী হবে।

সহজ সংস্কার সাধারণ-মানুষের মনকে অভিভূত করে রাখে। গতানুগতিকতা পূর্ব থেকে চলে আসা যে ধারা তারই অনুবর্তন, মধ্যযুগীয় জাতি-ধর্ম গোষ্ঠী সম্প্রদায় বোধের প্রাবল্য মানুষকে পিছনের দিকে টানে। আবার রুজি রোজগারের জন্য ও জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনে মানুষ আধুনিক যন্ত্রোৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে নিজেদের সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়।, গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ চাষ-আবাদ ও কুটির শিল্প ছেড়ে দিয়ে শিল্পাঞ্চলে, বাণিজ্যবন্দরে, খনিতে, বাগানে-কারখানায়, অফিসে, বিদ্যালয়ে ও শহরের কাজে ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে এসে একই সঙ্গে কাজ করে। এই সব কর্মক্ষেত্রে সকলের সাধারণ স্বার্থ এক হয়ে যায়। মালিক গোষ্ঠীর অধীনে একই নিয়মের বাঁধনে কাজ করা, মজুরি ও বেতন পাওয়া, সুযোগ-সুবিধার ও ন্যায্য অধিকারের দাব তোলা ও একত্রে সংগ্রাম করা ইত্যাদি, সকলে এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান বাঙালী-অবাঙালী সকলেই সমান এক সঙ্গে কাজ, এক নিয়মের কাজ, একই স্বার্থে মালিকের বিরুদ্ধে বা সরকারী বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

উৎপাদনের কাজে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটাই আসল, অন্য কোন সম্পর্ক নেই শাসকগোষ্ঠী ও মালিকের কাছে। কাজেই মালিক ও শাসকগোষ্ঠী একদিকে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত-মেহনতী মানুষ অপর দিকে। প্রকৃত পক্ষে ধনিক ও শ্রমিকের সম্পর্কটাই আমাদের পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রধান সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুনাফালোভী মালিক সকলকেই শোষণ করে ভোগ করতে চায়; খেটে খাওয়া শ্রমিক ন্যায্য মজুরিতে কাজ করে বাঁচতে চায়।

সকল সাধারণ মেহনতী মানুষ, মধ্যবিত্ত-শিল্পী-সাহিত্যিক ব্যবসায়ী ছাত্র, শিক্ষক-উকীল-ডাক্তার—এঁদের সকলের স্বার্থ এক হয়ে গেছে মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচার বিধানের বিরুদ্ধে। গোটা সমাজ ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই মালিকের এক দড়িতে বাঁধা। সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই এতে।

জাতি ধর্ম সাম্প্রদায়িক সংস্কার মুক্ত করে সর্বসাধারণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আকৃষ্ট করে তোলাই আজকের দিনের কাজ। সকল রাজনৈতিক দল, বিপ্লব প্রয়াসীদল, শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিক-ছাত্র-যুব ও প্রচারকের শ্রেণী সংগ্রামের পথেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। প্রগতি ও জনকল্যাণব্রতী মানুষের এর চেয়ে পবিত্র কর্তব্য আর কিছু নেই।

দাঙ্গার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল হবে জনগণের বাঁচার ও অগ্রগতির আন্দোলনগুলি সুষ্ঠু ও সতেজ করে তোলা—জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলা। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করবে অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ইত্যাদির দুর্গতি থেকে রক্ষা করবে, উন্নতির পথ প্রশস্ত করবে।...

বিংশ শতাব্দী

পৌষ ১৩৭০

[১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত]

বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন

শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিলাতী শিক্ষা ও শাসনের প্রভাবে বিলাতী সভ্যতার ঢেউ আসে এদেশেও, ছাত্ররাই প্রথম মেতে ওঠে বিলাতী পোশাক পরিচ্ছদে, চাল-চলনে, কথা-বার্তায় ও আদব-কায়দায়। বাঙ্গালী সমাজের সেকেলে ধর্ম, সামাজিক ব্যর্থতায় আচার-আচরণ, চলন-বলন, তাদের কাছে অবজ্ঞাত। গোঁড়া হিন্দুয়ানী ছেড়ে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে বিলাতী ধরনে, বিলাতি **style of living**-এর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ছাত্রজীবন প্রবাহ গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন পথে প্রবাহিত হতে লাগল। ছাত্রদের জীবন ধারাই ক্রমে সমগ্র যুব-সমাজে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

এমনি সময়ে ইংরাজ শাসনের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে বাংলা দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। বিলাতি পণ্যদ্রব্য বর্জন দ্বারা বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় তোলে।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে জোয়ার আসে, সমগ্র ভারত ভেসে যায় সে-প্লাবনে। বাংলার ছাত্রজীবন প্রবাহের মোড় ফিরে যায় এ-আন্দোলনে। স্বদেশী আন্দোলনের রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে **Anglicized** ছাত্ররা ঘুরে দাঁড়ালেন ইংরাজের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। পণ্যদ্রব্য বর্জনের কাজে, বাজার-বন্দর পিকেটিং করার কাজে তারা উৎসাহের সহিত এগিয়ে আসেন। ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে বিশেষ ভলান্টিয়ারের পোশাকে তারা বিলাতি দ্রব্য বর্জনের কাজে ব্রতী হয়ে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে আসেন —পুলিশের অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেন। স্কুল-কলেজে ইংরাজ শাসকের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের দাবিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্দোলনও তারা করেন, ফলে ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যায়তন থেকে অনেক ছাত্র বিতাড়িত হয়। 'বঙ্গ-ভঙ্গের' বিরুদ্ধে 'রাখীবন্ধন' করা, প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করার কাজে তারা উদ্যোগী ছিলেন। ১৯০৫ সালের জাতীয় আন্দোলনের সক্রিয় সংগ্রামে ছাত্ররাই অগ্রণী ছিলেন।

'ছাত্রমনতরী গড়িয়া, দেশ মাকে স্মরিয়া' তারা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন। বিলাতিদ্রব্য বর্জন, বিলাতি শিক্ষা বর্জন সর্বশেষে বিলাতি-শাসন বর্জন করার সংকল্প ছিল তাদের মনে।

কঠোর সরকারী নিষ্পেষণে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে আসে, কর্মী নেতারা যখন জেলে ও নির্বাসনে লাঞ্ছিত হচ্ছেন, অন্যেরা হাল ছেড়ে বসেছেন, ছাত্র নেতারাই তখন জাতীয় নেতাদের উপর নির্ভর না করে নিজেরা সংস্কার মূলক প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলনকে বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্নত পর্যায়ে তুলে ধরেন,—সতেজ সাহসিক সংগ্রাম পথে উদ্ভিন্ন যৌবন জাতীয় চেতনার স্ফূরণ করেন। বিপ্লবী সংগ্রাম-সমিতি গঠন করে দেশে অগ্নিযুগের রক্ত পতাকা জাগিয়ে তোলেন জনমনে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠন গড়ার কাজে তারা আত্মনিয়োগ করেন।

ছাত্রদের মধ্যেই প্রধানতঃ বিপ্লব দলের কাজ। ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদ করার জন্য রিভোলিউশন্ (Revolution) রাষ্ট্র-বিপ্লব একান্ত আবশ্যক। ইংরাজ শাসনের স্বেচ্ছাচারিতা, শোষণ, অত্যাচার ও রাজনৈতিক আন্দোলন পিষে মারার বর্বর অভিজ্ঞতা, কর্মীদের স্বভাবতই সশস্ত্র সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। বিপ্লব দলের ছাত্র কর্মীরাই সাধারণতঃ বাংলার স্কুল-কলেজ ক্লাবে ব্যায়ামাগারে পাঠাগারে ও সকল ছাত্র যুব প্রতিষ্ঠানে সেদিন বিপ্লবের বাণী (**Massage of Revolution**) বহন করে নিয়ে যায়।

এখনকার মত ছাত্রদের নিজস্ব কোন সংগঠন তখন ছিল না বটে, তবু সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সংগ্রামী কাজ, সে কাজে ছাত্রগণই উদ্যোগী হয়ে সাহসের সাহত এগিয়ে এসেছেন 'সম্মুখ সমরে'। সে যুগে শ্রমিক-কৃষক-কেরাণী-ছাত্র-যুবদের নিজস্ব পৃথক সংগঠন ছিল না। সংগঠন গড়ার উপযোগী অবস্থা ছিল না। সাময়িক কোন সংগঠন গড় উঠলেও প্রচণ্ড বাঁধার বিরুদ্ধে তা বেশীদিন টিকঁতে পারত না। স্কুল-কলেজে কোথাও হয়ত ছাত্র সমিতি গঠিত হয়েছে,—আবার উঠে গেছে কিছুদিন পরে।

বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির ছাত্র আন্দোলনের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এর কর্মকুশলতা, উদ্যোগ এবং সাংগঠনিক নযোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অপূর্ব ও সময়োপযোগী। 'ডিসিপ্লিন তো ছিলই'

নইলে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নিপুণ পুলিশ বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কাজ করা সম্ভব হ'ত না।

বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে ছোট ছোট ছাত্র দল (Group) তৈরী করে এর মাধ্যমে বিপ্লবী কর্ম ও যুদ্ধ করাই ছিল দলের কাজ। জাতীয় স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপিত করে রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য ছাত্রদের সশস্ত্র সংগ্রাম চেতনা জাগানোই ছিল প্রাথমিক কাজ। তার জন্য বিপ্লবী সাহিত্য, বিপ্লবী ইতিহাস, দেশের ও বিদেশের গেরিলা যুদ্ধকাহিনীর কথা পড়া অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দ্ধারিত ছিল। ব্যায়াম ও খেলায় যোগদান করে ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে মিশে তাদের ধীরে ধীরে বিপ্লবী সংগ্রাম পথে রিক্রুট করে আনা একটি করণীয় কাজ।

ক্লাব, আখড়া, পাঠাগার, জিমন্যাসিয়াম, সেবাসমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেখানেই ছাত্র ও যুবশক্তির কাজ ছিল, সেখানেই বিপ্লবী দলের ছাত্ররা যোগদান করে নিজেদের প্রভাব স্থাপন করতেন। বিপ্লবী ছাত্ররাই সর্বত্র জনপ্রিয় অগ্রণী কর্মী বলে গণ্য হতেন এবং বিপ্লব দলের শক্তি সংহত করতেন। সারা বাংলায় পরিকল্পিত ভাবে শৃঙ্খলার সহিত চরিত্রবান বুদ্ধিমান ছাত্ররা এ কায়দায় কাজ করে বিশাল শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। হাজার হাজার ছাত্র ও যুবক এভাবে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম যুগে বিপ্লবীদের নিজস্ব সাপ্তাহিক 'যুগান্তর', বিপ্লবের বার্তা বহন করে নিয়ে গেছে সহর ও গ্রামের স্কুল, কলেজে, পাঠাগারে ও ছাত্রদের হোষ্টেলে। ছাত্ররাই এ কাগজ বিক্রী করতেন। পুলিশের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কু-নজরে পড়েও তা নানা কৌশলে সহস্র জনের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ছাত্ররা নিজেরাই করতেন।...

সকল ছাত্ররাই সেদিন এ-দলের কাজকর্ম ও পত্র পুস্তিকার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক যত ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন নিষ্ক্রিয় সমর্থক যারা ইংরাজ-রাজের পুলিশি সন্ত্রাসের ভয়ে দূরে থাকতেন। বিরোধীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন পুলিশের সাহায্য প্রাপ্ত গুপ্তচর। এরা ছাত্র সংগঠনের সংবাদ পুলিশকে দিলে বিপ্লবী ছাত্ররা তাদের চিহ্নিত করে রাখতেন।—কর্মপদ্ধতি দুইভাগে বিভক্ত ছিল অসামরিক সামরিক (Civil & military)। সংগঠন, প্রচার ইত্যাদি অসামরিক বিভাগের কাজ অস্ত্রসংগ্রহ করা, বোমা তৈরী করা, পিস্তল-

রিভলবার মেরামত করা, সকলের উপর শত্রু নিধনের ও অর্থসংগ্রহের কাজ, ("action")। সংগঠন গড়ার পথের অন্তরায় আই. বি. পুলিশ অফিসার ও গুপ্তচর হত্যা করা, অত্যাচারী আমলাতন্ত্রের দুর্ধর্ষ ইংরাজ অফিসারদের গুলি করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মনে ভীতি সঞ্চার করা ও জনসাধারণের ইংরাজ ভীতি দূর করা। এপথে চলতে চলতেই এক সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হয়েছিল; অবস্থার পরিবর্তন না হলে এমনি অনেক বৃটিশ অস্ত্রাগার দখল করার পরিকল্পনা ছিল। যাক্ এ কথা—

স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য 'স্বাধীনতা ও Liberty' নামে বাংলা ও ইংরাজী পুস্তিকা অতি গোপনে, শৃঙ্খলার সহিত মাঝে মাঝে বিতরণ করা হত। কলেজের ক্লাশে, হোষ্টেলের সিটে সিটে একখানা মুদ্রিত পুস্তিকা থাকত। কলেজ খোলা হলে বা সান্ধ্য ভ্রমণ করে ছাত্ররা হোষ্টেলে-মেসে ফিরে এসে এই কাগজ দেখে বিস্মিত হতেন। কেউ পড়ে লুকিয়ে ফেলতেন, কেউ বন্ধুদের সাথে গোপনে পড়তেন, কেউবা পড়ে ভয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়ে দিতেন। পুলিশ আসতো, হৈ-চৈ হত, দু-একজন সন্দিগ্ধ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত।

চন্দননগরের ছাত্রনেতা কানাইলাল দত্ত ফাঁসীতে জীবন দিয়েছেন— বহরমপুর কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রনেতা নলিনী বাকচী ঢাকায় পুলিশের গুলিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন, রাজসাহী কলেজের ছাত্র নেতা প্রবোধ ভট্টাচার্য পুলিশি নির্যাতনে কুমিল্লায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তাছাড়া আরো শত শত ছাত্র কারাগারে-দ্বীপান্তরে বন্দীজীবনের লাঞ্ছনা অম্লান বদনে সয়েছেন—এ সবই দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অধীনতা থেকে জাতীয় মুক্তিলাভের জন্য।

...বিপ্লবী ছাত্রদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯২০ সাল অবধি তাদের ত্যাগ, দেশপ্রেম ও নির্ভীক সংগ্রাম, এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মাঝে পাঞ্জাবী ছাত্রদের শত্রুর গুলির মুখে দাঁড়িয়ে জীবনদান দেশের মানুষকে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ছাত্রদের যে প্রেরণা জুগিয়েছে তারই ফলে ১৯২২/২৩ সাল থেকে উহাদের নিজস্ব সংগঠন দাঁড়িয়ে গেল। ১৯২২/২৩ সালে "নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি" (All Bengal Students Association— A. B. S. A.) গড়ে উঠল সংগঠন হিসেবে"

ছাত্র সংগ্রাম

৩য় বর্ষ, ৯ থেকে ১২ সংখ্যা, ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৮, সম্পাদক বিমান বসু

বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলনের স্মৃতিকথা

বিপ্লবী আন্দোলনের স্মৃতিকথা লিখতে বসে জোয়ার ভাঁটা বা শীত বসন্তের ঋতু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়মের কথা মনে হয়। মানবসমাজেও তেমনি পরিবর্তন আসে,—পুরাতন যায়, নতুনের উদ্ভব হয়। গতানুগতিক চলার পথে মানুষের চিত্ত-মানস উদ্বেল হয়ে ওঠে,—স্বচ্ছন্দ জীবনের তাগিদে, পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টির প্রয়োজনে, নতুনের টানে, মানুষের মন যখন ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তখন সমাজের অগ্রণী অংশে, প্রাণ-চাঞ্চল্যের স্ফুরণ হয়, তাদের আগে চলার পথে গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। ক্রমবৃদ্ধিশীল কর্মপ্রেরণা ও কর্মোদ্যোগ সমাজে আড়োড়ন সৃষ্টি করে,—নতুনের ডাকে ব্যথিত জনসমাজে সাড়া পড়ে যায়। নতুনের এ অভিযানে পুরাতনের আভিজাত্য পরাক্রম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ভোগ দখলের অধিকারে নতুনের স্থান নেই।

এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের 'স্বাধীনতার' নব অভিযানে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আধিপত্য তরবারী হস্তে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু গেল শতাব্দীর ছোট বড় বহু বিদ্রোহের মতো এবার আর নব-অভ্যুত্থিত বিপ্লবী শক্তি অত্যাচারের রক্তে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব হল না। এখন থেকে সুরু হল ভ রতে রাষ্ট্রবিপ্লবের জয়যাত্রা।

ইংরাজের গুলি-গোলা, ইংরাজের শস্য-সম্পদ লুণ্ঠন ও শাসনদণ্ডের সঙ্গে বিদেশী ইংরাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও যন্ত্র-শক্তির আমদানীতে নব শিক্ষিত শ্রেণীর লোক অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিলাতী-সভ্যতায় মোহমুগ্ধ শিক্ষিতদের প্রভাবে দেশে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রভাব ম্লান হয়ে পড়ে। ছলে ও পাশবিক-বলে ইংরাজ ভারত অধিকার করে শিক্ষিতদের সাংস্কৃতিক মন জয় করে।

কিন্তু মানুষের সংগ্রামী-চেতনা ভোলার নয়। জীবনের অভিযানে সে কখনো অনড়, অসার হয়ে থাকতে পারে না। অতীত বিদ্রোহের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী দেশের কর্মী-মনে দোলা দিয়ে যায়। সেই পরাধীনতা, সেই দাসত্বের অপমান, সেই শাসন, পীড়ন ও শোষণের গ্লানি,—সবই আছে। থাকবে না কি

শুধু মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহ? সেই সশস্ত্র বিদ্রোহের বীরপণা, রক্তাক্ত সংগ্রাম ও জীবনদান আজকের দিনে শিক্ষিত যুবকদের প্রেরণা যোগায়—সাহস যোগায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতেই নব্য শিক্ষিতদের এক অগ্রণী অংশ ইংরাজের সাংস্কৃতিক বিজয়-অভিযানে অভিভূত না হয়ে রুখে দাঁড়ালেন ইংরাজ অধীনতার বিরুদ্ধে, ভারতের সভ্যতা, স্বাধীনতা ও নবজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র পন্থা। তাঁরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন ;—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'। উনবিংশ শতাব্দীর ছোট বড় বিদ্রোহগুলি ইংরাজ অতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এবার নতুন বিপ্লবীরা আরো গভীর আরো সুসংগঠিত এবং ব্যাপকভাবে ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের কল্পনা করেন। দেশে ও বিদেশে যত বিপ্লব ও বিদ্রোহ ঘটেছে—তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলার শিক্ষিত তেজস্বী কর্মীরা বিপ্লবী সংগ্রামের পথে নেমেছেন।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতা ও কর্মীদের মনে দেশের স্বাধীনতাই কাম্য। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর জন্যই ভারতের স্বাধীনতা-তাদের লক্ষ্য। ভারতমাতা আজ পরাধীন, শৃঙ্খলতা। ভারতমাতার মুক্তি সাধন সকল দেশের মানুষেরই করণীয় কাজ। আমরা ছোটবেলা এই চিন্তা ধারা নিয়েই কাজে ব্রতী হয়েছিলাম। হিন্দুর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা বাঙালীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন কল্পনাই ছিলো না।

লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগ করে দেওয়ায় বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন গর্জে ওঠে। এ আন্দোলনের ফলে যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় তাতে বিপ্লবী দল গঠনের সুযোগ বেড়ে যায়, নতুন কর্মীরা এসে দল পুষ্ট করে। ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তির আঘাত ছাড়া আর পথ নেই, এ-ধারণা দেশে প্রবল হয়ে ওঠে।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন থেকে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। সরকারী নিষ্পেষণে তিন বৎসরের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। নিষ্ক্রিয় স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের যৌক্তিকতা-বোধ প্রশস্ত হয়।

১৯০৬-৭ সালে অনুশীলন দলের যুব-সংগঠন, লাঠি-ছুরী খেলা (যা ছিল প্রকৃত পক্ষে বন্দুক, পিস্তল, তরবারী চালনা শিক্ষা), কৃত্রিম যুদ্ধ (মক ফাইট) শিক্ষা, ড্রিল ও প্যারেড ইত্যাদী সুরু হয় পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, ত্রিপুরায় ও আসামের কতকাংশে। সহস্র সহস্র যুবক এই বিপ্লবী দলের ভলান্টিয়ার সেনা

বাহিনীতে যোগ দেয়। অনুশীলনের একটা অংশ কলকাতায় 'যুগান্তর' পত্রিকায় বিপ্লব ও বিদ্রোহের অনল বর্ষণ করে, যুবকদের বিদ্রোহে উন্মত্ত করে তোলে।

এমনি সময়ে ক্ষুদিরামের বোমা ফাটে—বোমার আওয়াজে সারা ভারত কম্পিত হয়ে ওঠে। ঊষার আলোক ছটায় নিদ্রিত মানুষ যেমন সহসা জেগে ওঠে, নতুন দিনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে, পরে পরাধীনতার মোহতন্দ্রা ভেঙ্গে ভারতের মানুষও বাংলার বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বোমার শব্দে স্বাধীনতার চেতনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। পূর্ববাংলার শহরে ও গ্রামে ক্ষুদিরামের ফাঁসির সংবাদ এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে—ইংরাজ বিরোধী ক্রোধাগ্নি বিক্ষুব্ধ মানুষের মনে বিদ্রোহের আশা-উদ্দীপনা নিয়ে আসে।

আমরা ছাত্ররা তো দেশপ্রেমিক কর্মবীর ক্ষুদিরামকে আদর্শ কর্মীরূপে বরণ করে নিলাম। শহীদ ক্ষুদিরামের ফটো হাজারে হাজারে বিক্রী হয়ে গেল। আমরা বাড়িতে দেশহিতৈষী বিপ্লবীর ফটো গভীর শ্রদ্ধাভরে উচ্চমঞ্চে স্থাপন করলাম।

পূর্বে রেল-ষ্টীমার সংযুক্ত গোয়ালন্দ ষ্টেশনে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবকে গুলি করে যুবকদের বীরদর্পে সরে পড়ায় আমাদের মনে যে উৎসাহভরা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিলো ক্ষুদিরামের বোমা আর ফাঁসীতে জীবনদান তার চেয়ে অনেক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে আমাদের মনে। সরকারের কয়েকজন অনুগত খয়ের খাঁ ছাড়া আর কেউ ভারতের উদ্ভিন্ন জাতীয় জীবনের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের মহান আত্মত্যাগ ও মহান লক্ষ্যের প্রশংসা না করে পারেন নাই। কেউ বেসুরো কথা বললে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করতাম এবং তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতাম যে, দেশে এমন দেশহিতৈষী কর্মীরই আজ প্রয়োজন।

মহারাষ্ট্রীয় নেতা তিলক পুনার 'কেশরী' পত্রিকায় ক্ষুদিরাম ও তার বোমার সমর্থনসূচক প্রবন্ধ লিখে ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। দেশের শাসন পদ্ধতির দোষেই বিপ্লবীর বোমা ফাটে। একথা লিখে তিলক ক্ষুদিরামের মুক্তির দাবি করেন। পরাঞ্জপে 'কাল' পত্রিকায় লিখলেন, "স্বরাজ্য অর্জনের জন্যই এরূপ অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এ দেশের বোমা আর রাশিয়ার বোমা নিক্ষেপের তফাৎ এই যে, রাশিয়ার অনেক লোক জার সম্রাটের সপক্ষে আছেন, আর আমাদের এ-দেশে ইংরাজ সরকারের সমর্থক নাই বললেও হয়।" এ

লেখার অপরাধে 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক বোম্বাই হাইকোর্টে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলেন।

ক্ষুদিরামের বোমার আওয়াজে সুপ্তিমগ্ন ভারতবাসী জেগে উঠেছে বুঝে আমাদের আনন্দ আর ধরে না। ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে সারা পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, ত্রিপুরায় ও আসামের কতকাংশে অনুশীলন বিপ্লবী সংগঠন প্রসার লাভ করে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি ভয়-ভীতির পরিবর্তে বিপ্লব দলের শক্তি বৃদ্ধি করে। বাংলার শান্তশীল যুবকগণ অশান্ত দৃঢ় অনমনীয় হয়ে ওঠে। আমি স্কুলের ছাত্র থাক.কালেই অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়েছিলাম। বিপ্লবের গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কাজ করেছিলাম। শিক্ষা পেলাম বিপ্লব বা **Revolution** আনাই আমাদের কাজ—স্বাধীনতার জন্য **Revolution** চাই (অর্থাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব চাই)। রোমাঞ্চকর 'রেভলিউসন' শব্দটিই ধমনীতে উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ সঞ্চার করে। আমাকে রোমাঞ্চিত করে দিল এই কথাটি। আমার অন্যান্য বিপ্লবী-বন্ধুদেরও তেমনি দিয়েছে। তখনকার দিনে আমরা স্কুলের ছাত্ররাও বাংলার চেয়ে ইংরাজী কথা, ইংরাজী শব্দই বেশী পছন্দ করতাম। **Revolution** শব্দটির সাথে জড়িত ছিলো ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে গুপ্ত সমিতি, সশস্ত্র সংগ্রাম, বিদ্রোহ, সর্বোপরি রাষ্ট্রবিপ্লব। বিপ্লব, রক্ত-বিপ্লব।

স্বাধীন সোনার ভারতের স্বপ্নে আমরা বিভোর হয়ে যাই। ঘর-বাড়ি ছেড়ে, নাম যশের আকাঙ্ক্ষা আগ্রাহ্য করে আমরা কিশোর বয়সেই (১৯০৭-৮ সালে) সংকল্প নিলাম বিপ্লবী দলের কাজে আত্মনিয়োগ করব।

দেশে কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ জনপ্রিয় কাজ দিয়ে বিপ্লবীদের সংগ্রাম সুরু হয় এবং তার ফলেই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং জনসমর্থনে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই দত্ত, সত্যেন, বীরেন্দ্র প্রমুখ প্রখ্যাত বিপ্লবী শহীদ হলেন। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে আলিপুর জেলখানার ভিতর সিপাহী-সান্ত্রীর চোখের উপর হত্যা করে নির্ভীকচিত্তে ফাঁসিকাঠে আরোহণ করেন কানাই ও সত্যেন। প্রফুল্ল চাকী শত্রুর হাতে ধরা পড়ার প্রাক্কালে রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কাজ দিয়ে বাংলার বিপ্লবীরা দেশের, বিশেষ করে বিদেশের প্রশংসা অর্জন করেন। খ্যাতিসম্পন্ন সুশিক্ষিত অরবিন্দ ঘোষ বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বিপ্লবী দলের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হন। পুনার-মহারাষ্ট্রীয় যুবকদের ফাঁসি বা জাতীয় নেতা

তিলকের কারাদণ্ড, বাংলার মানুষকে জাতীয় আন্দোলনের দিকে বেশী করে আকৃষ্ট করে।

...সশস্ত্র বিপ্লববাদী না হয়েও বিপিন পাল, তিলক, লাজপত রায় প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠী দেশের সকল মুক্তিকামীকেই সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ঠেলে দিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী জাতীয়বাদীরা ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। শত শত লোক ফাঁসীতে ও গুলীতে জীবন দেন, দ্বীপান্তরে ও কারান্তরালে ধুঁকে ধুঁকে মরেন। তাঁদের জন্য দরদ দিয়ে কথা বলার মত নেতা ছিলেন না, কোন সংবাদপত্রও তাঁদের বাঁচার জন্য লেখনী চালান নাই। সে কি দুর্দিন গিয়াছে। কিন্তু বিপ্লবী যোদ্ধারা অম্লান চিত্তে সব সহ্য করেছেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখন নীরব—নির্বীর্য। কংগ্রেস অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ তার ভাষণে বলেন, "ভারতে এখনো স্বায়ত্তশাসনাধিকার চাওয়ার সময় আসে নাই।" নেতা গান্ধীজী বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ জয়ের জন্য ভারতে সেনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিলক, বিপিন পাল, লাজপত রায় প্রভৃতি বামপন্থী নেতারা হয় জেলে, নয় নির্বাসনে কালযাপন করছিলেন। আমরা সকল বিপ্লববাদী মুক্তি যোদ্ধারা এতে এতটুকু বিচলিত না হয়ে নিজেদের উৎসাহ, আত্মোৎসাহ ও কর্মকুশলতা দিয়ে ব্যর্থতা, বিপৎপাত ও ইংরাজ শাসকদের রক্তচক্ষুর মধ্য দিয়েই সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলাম। দুটি পৃথক বিপ্লবী সংগঠন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সহযোগিতা করে কাজ করেছে।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দেশবাসীর নীরব সমর্থন আমরা পেয়েছি, লোকের সক্রিয় সাহায্যবলেই একটা হত্যাকাণ্ডের পর বা অন্য কোন রকম সশস্ত্র কাজ করার পর আমরা নির্বিঘ্নে সরে পড়তে পেরেছি, অস্ত্রাদি নিরাপদ স্থানে রেখে যেতে পেরেছি, আশ্রয়স্থান পেয়েছি, অর্থ সাহায্য পেয়েছি, যাতায়তে পথ-প্রদর্শক পেয়েছি। স্ত্রী-পুরুষের এমনি কত সাহায্য আমাদের সংগ্রামের শক্তি যুগিয়েছে। অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে দরদীরা পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কাজ ও সংগঠনকে জোরদার করেছে। মা, বোন, বৌদিদের দুঃসাহসিক সাহায্যও প্রচুর পেয়েছি।

সাহিত্য, ইতিহাস, নাটক, কবিতাতেও মুক্তি সংগ্রামের উদ্দীপনা

জাগিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ," যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের "গ্যারিবল্ডী," মাৎসিনির "স্বাধীনতার-যুদ্ধ," সখারামের "দেশের কথা," রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কবিতা সশস্ত্র সংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

ডি এল. রায়ের নাটকে আছে;—"তরবারি স্পর্শ করে রানা প্রতাপ সিং আর রাজপুত সর্দাররা দেশ উদ্ধারের জন্য শপথ নিচ্ছেন, 'আমরা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত'।" এ অভিনয় পূর্ববঙ্গের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। আমাদের স্বাধীনতার স্বেচ্ছাসৈনিকদের মানসে রানাপ্রতাপের দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন মর্মস্পর্শী, ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের উতলা করে তোলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি-এ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক দেশের লোকের চেতনা ছিলো বিভ্রান্ত; পরাক্রান্ত বৃটিশ শাসকের বর্বর অত্যাচার আর শোষণের আঘাতে মানুষ ভীরুতায় ও স্বার্থপরতায় নিমজ্জিত। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা সব উবে যায়। পণ্ডিতেরা কতক অতীত গৌরবের দেমাক নিয়েছিলেন, আর কতক বিলাতী শাসন ও বিলাতী সভ্যতার তারিফ করতেন। দেশের লোকের কল্যাণ বা উন্নতির চিন্তা বিস্মৃতির অতলে ডুবে গিয়েছিলো। নৈরাশ্য হতাশা দিকে দিকে। 'ইংরাজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—'সরকারী কর্তারা বসে বসে এ ধারণাটা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। যাঁরাই এ অবনতির প্রবাহ রুখতে চেষ্টা করেছেন, পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন তাঁদের পথরোধ করেছে।...

আন্দোলনের অগ্রগতি-পথে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে বিপ্লবীদের চিন্তাধারারও অনেক পরিবর্তন আসে। তারাই আবার নতুন চিন্তা, নতুন কর্মধারা দিয়ে জনমানস নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজে রূপান্তর ঘটায়। সংগ্রামের সুরুতে আমাদের দেশে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাই প্রবল ছিল। ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও সকল কর্মনীতিতেই সর্বজন স্বীকৃত নীতি ছিল; এর বাইরে থাকা মানে লোকসমাজের বাইরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। সে-যুগের কল্পনা ছিল ইংরাজ রাজার স্থানে কোন দেশীয় জনপ্রিয় রাজাকে স্বাধীন ভারতের রাজসিংহাসনে বসাতে হবে, তবে বংশানুক্রমিক রাজা না হয়ে এক রাজার পর অন্য একজন ভালো রাজা নির্বাচন করতে হবে। দূর ভবিষ্যতের কল্পনা নিয়ে মাথা-ঘামানো স্বপ্নবিলাস মাত্র, তাই এ-আলোচনা আর এগোয়

নি। সেদিন রাজা-জমিদার, গুরু-পুরোহিত শাসন ছাড়া দেশ ও সমাজ চলতে পারে বলে ধারণা ছিল না।

পরবর্তীকালে আমরা সাধারণ-তন্ত্র ভারত (রিপাব্লিক) পছন্দ করতাম। ১৯১৫ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণার আয়োজন হয়, যাতে আমেরিকার সাধারণ তন্ত্রের মতো ভারতে সংযুক্ত সাধারণ তন্ত্র (ফেডারেল রিপাব্লিক অব ইণ্ডিয়া) ঘোষণা করাই স্থির হয়। ২১ শে জানুয়ারী প্রত্যুষে লাহোরে যে বিদ্রোহ ঘোষণার পরিকল্পনা ও আয়োজন হয়েছিল ওখানে স্বাধীন ভারতের ঘোষণাপত্রে ঐরূপ সাধারণতন্ত্র ঘোষণার ফেস্টুন ও প্রচারপত্র তৈরীই ছিল। সংবাদ ফাঁস হয়ে পড়ায় মধ্যরাত্রে পুলিশ তল্লাশীর সময় বহু বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রাদির সঙ্গে ঐ ঘোষণাপত্রও পেয়ে যায়। ঘোষণা আর হ'ল না;—হ'ল গ্রেপ্তার, গুলী, ফাঁসি ও কারাদণ্ড।

তখন আমেরিকা পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুটা প্রগতিশীল রূপে পরিগণিত ছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রগঠন চিন্তার নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। গণতন্ত্রের কথা সবাই বলতেন। সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আর পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র (বুর্জোয়া গণতন্ত্র)—এ দুই বিপরীত ধরনের গণতন্ত্র চিন্তা ছাড়াও গান্ধীজীর দুর্বোধ্য গণতন্ত্র ছিলো। সশস্ত্র বিপ্লবীরা অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত হতে চায়নি। ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদই তাদের আশু লক্ষ্য। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করে বিপ্লবীরা "স্বাধীন সাধারণতন্ত্র" ঘোষণা করেন।

উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীরা শচীন সান্যাল ও যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সঙ্ঘ" (হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন) নাম দিয়ে ওখানে গুপ্ত সমিতি পুনরগঠন করেন। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটা স্পষ্ট পরিকল্পনাও স্থির করেন ১৯২৪ সনে। 'ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র' (ফেডারেল রিপাব্লিক অব ইউনাইটেড ষ্টেটস অব ইনডিয়া)। এরা কিন্তু সমগ্র কার্যকলাপ দিন দিন প্রসারিত ও তীব্রতর করছিলেন। এই সমিতি পরে পাঞ্জাবেও কাজ করতে থাকে। পরে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আইডিয়া এ দেশবাসীর মনেও রেখাপাত করায় ঐ বিপ্লবী দলটি পূর্ব নাম পরিত্যাগ করে 'হিন্দুস্থান সমাজবাদী সমাজতন্ত্রী সঙ্ঘ' নাম গ্রহণ করে। আমাদের বাংলার অনুশীলন পার্টির কর্মীরাই উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে ঐ নামে সন্ত্রাসবাদী কার্য চালাতে থাকেন। ১৯২৮ সালে

সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পুলিশ পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়কে লাঠি দ্বারা অমানুষিক প্রহার করে। সভায় উপস্থিত বহু লোককে বর্বর লাঠি চালনা করে আহত করে।

লাহোরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (সহকারী) সাণ্ডার্স সাহেব এ আক্রমণ পরিচালনা করেন বলে ঐ বিপ্লবী দলের নেতা ভগৎ সিং সাণ্ডার্সকে গুলী করে হত্যা করেন। ভগৎ সিং পরে ধরা পড়ে লাহোরে ইংরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসিতে জীবন দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করে বৃহত্তর বিপ্লবের চিন্তা আসে বাংলাদেশের পুরানো বিপ্লব দলে। যুদ্ধের সময় ভারতব্যাপী বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ইংরাজ সেনাবাহিনীর অনেক সেনা ও বিপ্লব সম্পর্কিত বহু লোক ফাঁসিতে ও গুলীতে মরেন। ভারতের সহস্র কর্মী কারাগারে ও অন্তরীণে আবদ্ধ হলেন।

যুদ্ধের পর নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর বিপ্লবের কল্পনাই বিপ্লবী নেতাদের মনে আসে। গান্ধীর ভারতব্যাপী বিরাট জন-আন্দোলনের কাছে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একটি ছোট 'গ্রুপ' ঐ পুরনো পথই আঁকড়ে থাকেন। তাঁরা কয়েকটি ডাকাতি করেন। বীর যুবক গোপীনাথ সাহা অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবকে মারতে যেয়ে ভুলক্রমে অন্য একজন সাহেবকে গুলীতে হত্যা করেন। গোপীনাথ ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং বীরের মতো ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করেন। আরো পুলিশ গুপ্তচর হত্যার চেষ্টা হয়। চট্টগ্রামেও ডাকাতি ইত্যাদী হতে থাকে। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের হেড অফিসে তথাকার এক বিপ্লবী দল দুঃসাহসিক ডাকাতি করে হাজার হাজার টাকা নিয়ে যায়। গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হলে তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তখন বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সংগঠন প্রচার কার্য ও বিদ্রোহাত্মক ইস্তাহার আবার বিলি হতে থাকে। ইংরাজ কঠোর দমনমূলক আইন পাশ করে আমাদের বহু বিপ্লবী দলের কর্মীদের কারারুদ্ধ করে। আমরা ১৯২৮ সালের প্রথম দিকেই কারামুক্ত হই। এবার কিন্তু ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কাজের ঝোঁক আর বড় একটা দেখা গেল না।

জেলে বসে নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দেরা পরামর্শ করেন,—'এবার বাইরে যেয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব। আমরা ঐক্যবদ্ধ হলে আর কোন শক্তি

আমাদের কাছে দাঁড়াতে পারবে না। অহিংসপন্থী কংগ্রেস বাংলাদেশে আমাদের বিপ্লবীদের জোটের কাছে টিকতে পারবে না।'

বিপ্লবী দলের কর্মীরা ত্যাগী একনিষ্ঠ দেশহিতৈষী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন বলে তাঁরা জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা লাভ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসী নেতারা, জমিদার, উকিল বা ধনী ব্যবসায়ী রূপে কিছুকালের জন্য জেল খেটে নাম যশ পেয়ে কংগ্রেসের নেতা হয়ে বসেছেন। স্বভাবত বিপ্লবী দলের কর্মীরাই লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করেছে।

সম্প্রতি কারামুক্তির পর বিপ্লবী দলের নেতা ও কর্মীরা ১৯২৮ সনে দেশে বিপুল অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন পেয়েছিলেন। তাঁরা সকল দল মিলে ঐক্যবদ্ধ 'স্বাধীনতা সঙ্ঘ' গঠন করেছেন জেনে লোকে খুবই উৎসাহিত ও আশান্বিত হয়। অজ্ঞাত কর্মীরা দীর্ঘকাল গুপ্তভাবে থেকে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ তাঁরা প্রকাশ্যভাবে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের কথা বলে দেশে সংবর্ধনা পাচ্ছেন। কংগ্রেসেও তাঁরা বিভিন্ন উচ্চ পদে স্থান পেলেন। এমন অপূর্ব সুযোগ এসে গেলেও বিপ্লবী নেতারা তার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি বুঝে প্রায় সকল কংগ্রেসী নেতারা ১৯২৮-২৯ সালে বিপ্লবী দলের এ নতুন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করতে উন্মুখ হলেন। অনুশীলন-যুগান্তরের বিপ্লবী নেতারা অ-বিপ্লবী নেতাদের নানা স্বার্থে দলে গ্রহণ করায় বিরোধিতা করতে পারলেন না। সুভাষ বসু, কিরণ শঙ্কর রায়, আবুল কালাম আজাদ, জে. এম. সেনগুপ্ত প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে যে দল হবে তা আর যাই হউক, সশস্ত্র বিপ্লবের দল হবে না। ফলে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগঠন গড়ার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। আসলে বিপ্লবীদের কোন প্রকৃষ্ট নীতি ও কর্মপন্থা ছিল না। নতুনভাবে কৌশলপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী নিয়ে সংগ্রামের পথে এগুবার কোন ইচ্ছা, আগ্রহ ও কর্মী সংগ্রহের চেষ্টা ছিলো না। কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। ১৯২৯ সন থেকে পুরানো বিপ্লবী নেতৃত্ব একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ইংরাজের দুঃশাসনে তাঁদের বন্দী জীবন যাপনের অবসান হল না। সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে কতক বিপ্লবী গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে ভেসে গেলেন। আর সকলে 'এদিকও নয় ওদিকও নয়'—অবস্থাতে রয়ে গেলেন।

ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব দল গড়ার চেষ্টার ব্যর্থতা থেকে নতুন উদ্যমের উদ্ভব হোল। ১৯২৮-২৯ সালে দুই পুরানো বনেদী দল থেকে বেরিয়ে এসে কতক কতক আগ্রহশীল বিপ্লবী যুবক এক নতুন সংগ্রাম পদ্ধতি নিয়ে কাজে নামেন; এরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী, কিন্তু পুরানো নেতাদের ভারতব্যাপী বৃহৎ বিপ্লবের গালভরা কথাও আজগুবী মনে করেন। এ দুই অকেজো পন্থার মাঝামাঝি একটা সুষ্ঠু সংগ্রামের কার্যপদ্ধতি তারা গ্রহণ করেন। অল্প কয়েকটি স্থানে একই সময়ে সরকারী ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য তারা চেষ্টা করতে থাকেন। তারা অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে আক্রমণ করার **Shock troups** এর মতো সহসা দুঃসাহসিক প্রচণ্ড আঘাত (**Bull shock**) দিয়া শত্রুর শিবির ঘায়েল করতে চান, দিনে দিনে উৎসাহী যুবকগণ অনুশীলন ও যুগান্তরের দলের আনুগত্য ছেড়ে এ নতুন উদ্যোগে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেন।

এ নতুন সংগ্রামপন্থীরা মনে করেন, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী ঝোকের মোড় ফিরাতে হবে এরূপ কাজ করব। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যে দলাদলি চলছে এরূপ আক্রমণে একদল যুবকের রক্তদানে দেশের দলাদলিরও অবসান হবে। তখন কংগ্রেসে, শ্রমিক আন্দোলনে, ছাত্রআন্দোলনে, দুই দলের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে; বিপ্লবী দলেব দলাদলি তো ছিলই। দলাদলির ফলে দেশের অগ্রগতি মন্থর হচ্ছে, আর একদিকে সাধারণ লোকের মনে সংগ্রামী মোনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দলাদলির হানাহানি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিপ্লবীর রক্তাক্ত সংগ্রামই আজ কাম্য, আমরা জেল থেকে আইরিশ বিপ্লবী 'লেলর' এর বাণী অন্তরে গেথে নিয়ে এসেছিলাম। যতিন দাস, নিরঞ্জন সেন, গনেশ ঘোষ ও সতীশ পাকড়াশী মেদিনীপুর জেলে বিপ্লবী ইতিহাস পড়ে বাইরে এসে নতুন ভাবে দাঁড়াবার কথা আলোচনা করতেন। লেলর বলেছেন, যে জাতি বহুদিন বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার লড়াই না করে তাদের সংগ্রাম শক্তি খর্ব হয়ে যায়। আমরা এতে অনুপ্রাণিত হয়ে এসেই নতুন ভাবে কাজে ব্রতী হলাম। অতি গোপনে আমাদের কাজ,—ইংরাজ গুপ্তচর ছাড়া নিজের দল নেতারাও এরূপ কাজের বিরোধী।

আমরা ভেবেছিলাম **Bull shock** দিয়ে যদি আমরা দু-চারশ' যুবক শত্রুর গুলিতে মরেও যাই, তাতে জাগবে—সংগ্রামী রক্তপ্রবাহ দেশের যুবকচিত্তে উষ্ণপ্রবাহ বইয়ে দেবে। দেশের মধ্যে যত কিছু ভীরুতা, নিষ্ক্রিয়তা মত-পথের দ্বন্দ্ব ও মালিন্য আছে, সব দূর হয়ে যাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ত্যাগ ও জীবন উৎসর্গের মহান দৃষ্টান্তে। জীবনের জন্য তখন আমরা পরোয়া

করতাম না। সত্যিই কবির ভাষায় বলা যায়—'মৃত্যুর গর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মত।'

অনুশীলন দলের ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার বিপ্লবীকর্মীরা যুগান্তর দলের বরিশাল ও চট্টগ্রামের বিপ্লবীকর্মীরা ও খুলনার দলের কিছু কর্মী পুরনো নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে নিজেরাই নতুন উন্নত ধরনের সংগ্রামে নামার পরামর্শ করতে থাকেন। ১৯২৯ সালে রংপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে চাটগাঁ, ঢাকা ও কলকাতার প্রতিনিধিদের কয়েকজন নিভৃতে বসে। বিদ্রোহাত্মক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করে কর্তব্য স্থির করেন। এর পূর্বে ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সময় পাঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা ভগৎ সিং ও দক্ষিণ কলকাতার যতীনদাস প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী তরুণ একত্রে মিলিত হয়ে বাংলার নতুন গ্রুপ এবং নতুন সংগ্রাম নিয়ে কথাবার্তা বলেন। ভগৎ সিং পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে এ-ধরনের সশস্ত্রভাবে শত্রুকে আঘাত দিয়ে দ্রুতবেগে সরে পড়ার কৌশল আনার চেষ্টা করবেন বলে গেলেন।

অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টির পুরনো সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসা তরুণ বিপ্লবীদের বলতো 'রিভোল্ট গ্রুপ'। পুরানো দলের লোকের মুখে মুখে 'রিভোল্ট গ্রুপ' কথাটা এত প্রচার হয়ে যায় যে, পুলিশের এদের গতিবিধির উপর সন্দেহ-দৃষ্টি পড়ে। প্রস্তুতির পূর্বেই বিসর্জনের পালা এল। পুলিশ একযোগে বিভিন্ন জায়গা তল্লাশী করে ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে বহুকর্মীকে গ্রেপ্তার করে ফেলে। সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন ও রমেন বিশ্বাস মেছুয়া বাজারে গ্রেপ্তার হন। সুধাংশু দাশগুপ্ত বোমাসহ বাড়িতে প্রবেশ পথে ধরা পড়েন। নিকটবর্তী অপর এক বাড়িতে সহস্র সহস্র টাকার বোমা তৈরীর সরঞ্জাম ও রিভলবার ধরা পড়ে। বরিশালে অনেকে ধরা পড়েন। তাদের নিয়ে মেছুয়াবাজার বোমার মামলা হয়। যতীন দাস লাহোরে গিয়ে পূর্বেই গ্রেপ্তার হয়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। তাঁর উপর অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব ছিলো। তাঁর গ্রেপ্তারে আমরা খুব আঘাত পেলাম। কিন্তু আরব্ধ কার্য করতেই হবে। মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন ও আরো কয়েকজন দ্বীপান্তরে ও কারাগারে গেলেন। যতীন দাস রাজবন্দীদের প্রতি মানুষের মত আচরণের দাবিতে লাহোর জেলে দীর্ঘদিন অনশন করে মারা গেলেন। দেশে বিরাট আন্দোলন হওয়া সত্বেও ইংরাজ

শাসক গোষ্ঠী এতটুকুও পীড়ন নীতি সংস্কার করতে রাজী হয় নাই। সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন সেন প্রভৃতি কলকাতায় ধরা পড়ায় চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। তারাও ধরা পড়ে যেতে পারেন এই আশঙ্কায় দ্রুত আয়োজন করতে থাকেন। ১৮ ই এপ্রিল (১৯৩০) তারিখে চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা সাফল্যজনকভাবে অস্ত্রাগার আক্রমণ করায় সারা ভারতে আলোড়ন উপস্থাপিত হয়। তাদের বীরত্বব্যঞ্জক আক্রমণ জালালাবাদের লড়াই ও আত্মদান ইংরাজ রাজত্বে সংগ্রামের ইতিহাস উজ্জ্বল করে রেখেছে।

'রিভোল্ট গ্রুপ' বা 'এডভান্স গ্রুপ' যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩/৪ জেলায় একযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে পারতো, তবে গান্ধীর লবন আইন অমান্যের ব্যর্থ প্রয়াস আরো ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়ে যেত। ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্দীপনা আরো জোরালো হত।

পরেও সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু চট্টগ্রামের মত উচ্চতর সংগ্রামেব পথ তারা গ্রহণ করেন নই।

অনুশীলন দলের কর্মীরাও-রকম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের (armed rising) কল্পনা নিয়ে কাজ করেছিলেন কিন্তু কার্যত কিছু হয় নাই। তারপর আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়ায়-দিন বদলের পালা এল। শ্রমিক-কৃষকের গণশক্তির, সমাজবাদের আদর্শ এসে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রভাব ম্লান করে দেয়।

সাপ্তাহিক বসুমতী
শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬
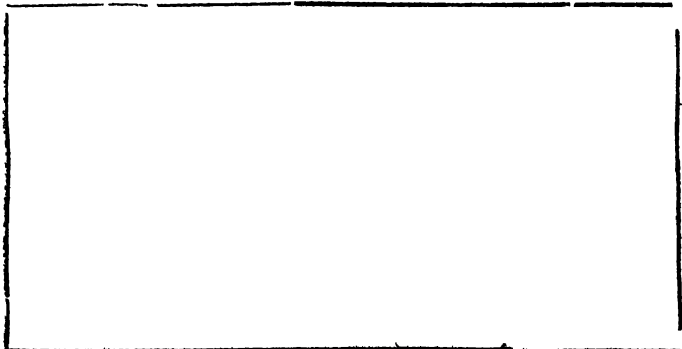
দিনলিপির
কয়েক পৃষ্ঠা

[সতীশ পাকড়াশী, নিয়মিত ডাইরী লিখতেন। সে ডাইরীর অনেকগুলিই পাওয়া যায়নি। কিছু উইপোকায় এমনভাবে কেটেছে যে তার থেকে কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যতটা সম্ভব হয়েছে, বৎসর ক্রমানুসারে তার অংশ বিশেষ প্রকাশ করলাম। শান্তিময় গুহ]

বক্‌সার জেল

১লা মে, ১৯৫১ :

আজ সতেরো দিন ফাল্গুন মাসের—ইংরেজী ১লা মার্চ। গতকালের তীব্র মাথা ব্যথার পর আজ সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে বুঝা গেল ব্রহ্মতালুর উত্তাপ এখনো রয়ে গেছে, তার অস্বস্তি বোধটা গতকালের ঝড় ঝাপটার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, শারীরিক ঝড় নয়, রাজনীতির ঝড়। সারাদিন মাথা ব্যথা ছিল, তা নিয়াই সারাদিন উপর নীচ যাতায়াত করতেও হয়েছিল। রাজনীতিক মতামত স্থির করার প্রশ্ন ছিল—কমিটির বিরুদ্ধে বিষোদগার ছিল আবার দ্রুত সিদ্ধান্ত করে সব কিছু শেষ করার তাগিদও ছিল বেশী। এর মত লইতো ওর মত পাই না। একজন একরকম ব্যবস্থা করতে বলছেন অপরজন তার বিপরীত কথা বলেন। কেউ মত দিচ্ছেন কেউ বা সাত তাড়াতাড়ি মত দিতে নারাজ। মতের মূল্য কারও কম নয়, যাচাই না করে, ভাল করে না বুঝেশুনে অনেকেই নিজের মত জাহির করতে অনিচ্ছুক। বিষয়বস্তু অনেক পুরানো তা নিয়া চিন্তা আলোচনা তো আর কম হয় নাই। তবু সে বিষয়ে কারও একটা লিখা বা রচনা পড়েই সমর্থন জানাতে অনেকে চান না।—বেলা বয়ে যায়। মতামতের দ্বন্দ্ব নিয়ে আর অপেক্ষা করা চলে না। কোন মতে চারটে খাওয়া গেল। দারুণ মাথা ব্যথা। এক ডোজ অষুধের গুঁড়া খেয়েই বিছানাই শুয়ে পড়লাম। মনে হল কম আরাম। ঘুমুলে মাথা ব্যথাটা হয়ত সেরে যেত। কিন্তু উপায় নেই। ৭/৮ মিনিট পরেই উঠে ঘড়িটা দেখলাম। অনেক কাজ বাকী আর বিশ্রাম করা যায় না। লিখতে বসলাম : লিখে সব গুছোতে লাগলাম। সময়ের ঘণ্টা বাজল। কাজ শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বেলা তখন ৩টা বেজে গেছে। সমতলভূমি দূর প্রান্তর সাদা কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পিছনের ভূটান পাহাডেব উপর উজ্জ্বল রৌদ্র কিরণ। গতকালটা এমনি ভাবেই এখানকাব 'খাবলা' আব মাথা ব্যথা নিয়ে কাটিয়ে আজ একটু হালকা বোধ কবছি। যেন প্রচণ্ড ঝড়ের পর সমস্ত প্রকৃতি শান্ত। কিন্তু বেলা যেতে না যেতেই জানা গেল আবো লোক আসছে। আমরা খুশী হলাম—মনে হল 'কে আবার বাজায় বাশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে।' এখানে আমবা ১৩৮ জন এসেছিলাম। নানা গুণে গুণী বন্দীদের জমায়েতে 'বকসা দুর্গ' গুলজার হয়েছিল। হেবিয়াস কর্পাস মামলার দৌলতে প্রায় একশ' জন পর পর চলে গেছে। আমরা ৪০টি প্রাণী এ নির্জন পুরীতে দিনের প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে ছিলাম। হয় মুক্তি (?) নয় সমতল বাংলায় ট্রান্সফার। মনে হয়েছিল এত সিপাই শান্ত্রীর বিরাট খবচ দিয়া ৪০টি নিরীহ প্রাণীকে সবকার বকসায় নির্বাসিত বেখে কি ই বা করবে। কিন্তু টাকার জন্য তাদের ভাবনা কি। লাগে টাকা দিবে গোবী সেন। বকসা ছাড়া যায় না। কমিউনিস্ট বন্দীদের সমাজ ও দেশের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আধুনিক সভ্যতার আওতার বাইরে পাহাড ও বনানীব মাঝে বন্দী করে রাখার মত সুযোগ আর কোথায়। আমাদের তারা এনে ফেলেছে বাংলাব বাইরে ভূটান সীমান্তে ভুটিয়াদেব দেশে। ইংরাজের লুঠেব অভিযানে বলি হয়ে বক্সা দুয়ার ইংরাজের বাংলাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ও উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতের কংগ্রেস সরকার দেবোত্তর সম্পত্তিব মত বক্সা পাহাড় ভোগ দখল করছে। স্বাধীনতা পেয়ে তারা এখানকার ভুটিয়াদের স্বাধীনতা ফিবিয়ে দেয় নাই—মাউন্ট ব্যাটনী স্বাধীনতার এমনি মহিমা। যদিও এ নির্জন পাহাড়ী অরণ্যে বন্দী হয়ে আসা মোটেই বাঞ্ছনীয নয় তবু জন বিরল কাঁটাতার বেষ্টিত ঐ 'বিশেষ কাবাগার' জন কোলাহল মুখরিত হযে উঠবে শুনে আমরা খুশীই হলাম। ঘবগুলি খালি পরে আছে—খেলায়, বেড়ানে, পড়ায়, আলোচনায় লোকাভাবটা বড়ই লাগে। সকলেব উপর খাওয়া দাওয়ার দুরবস্থা; ডেটিনিউ কম হলে দৈনিক খোরাকীর ভাতাও কম হয়। ডালভাত খেয়েই এখন আমরা বন্দীজীবন কাটাচ্ছি। অদ্ধেক সাথীরা থাকে উপরে, আমরা ১১ জন আছি নীচে—আমাদেরও নীচের থাকের ঘর দুটি খালিই পড়ে আছে। এক সময় ঐ দিকটায় ছাত্র ও তরুণ বন্দীদের উৎসাহ ভরা কোলাহলে মুখরিত ছিল। পাহাড়ী বন্দী শিবির উপর থেকে নীচে থাকে থাকে নেমে গেছে: আজ জন

বিরল থাকগুলি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রির আঁধারে সমস্ত কারাগার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে; মাঝে মাঝে নৈশ পাহারারত গাড়োয়ালী সিপাহীর কর্কশ বুটের আওয়াজ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

কলকাতার দৈনিক আসে এখানে দুতিন দিন পরপর—কখনো বা ৪/৫ দিন পর। আজকের পাওয়া 'কাগজে' ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার খবর জানা গেল। খবরটি সুখবর।…আশা করা যায় অবস্থার উন্নতি হবে-বাণিজ্যিক চুক্তি দীর্ঘ মেয়াদী হবে। ক্রমে ক্রমে দুই বাংলার দুস্থ শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ঐক্যবদ্ধ বাংলায় বাঙালীরা আবার মিলব। সে শুভদিনের কথা কল্পনাতেও আনন্দ পাই।

১৯৫২ মঙ্গলবার ১৬ই পৌষ ১৩৫৮:

আজকের দৈনিক কাগজে দেখলাম 'মানস সরোবরে' **Sea plane** নেমেছে। আমার কিশোর বয়সের স্বপ্নের দেশ কৈলাস পর্বত, কল্পনার রঙিন 'মানস সরোবর'। কত সুন্দর কত অপূর্ব শোভামণ্ডিত এই 'সরোবর'। সাধ ছিল কৈলাসের স্বর্গে আরোহণ করে দেবতাদের পুকুর 'মানস-সরোবর' দেখি কিন্তু সাধ্য ছিল না। হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী পড়ে বুঝেছিলাম ওখানে যাওয়া মানুষের অসাধ্য নয় দুঃসাধ্য তো বটেই।…

১৮০০০ হাজার ফিট পাহাড়ের উপর সর্বপ্রথম এরোপ্লেন লাসায় পৌছেছে ১২ ই ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে। ভারতের উত্তরে হিমালয়ে এশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত নিবাত নিষ্কম্প তিব্বতে আজ যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা। আমরা জীবনে কোনদিন ভাবি নাই যে তিব্বতের জনসমাজ আমাদের আগেই মুক্তিলাভ করবে। যা ভাবি নাই তা বাস্তবে পরিণত হল। দিন আগত ঐ ভারত তবু কৈ? পুঁজিবাদ যা পারে নাই সমাজবাদ তিব্বতে তা পেরেছে। ভারতের নরনারীর কাছে এতদিনে নতুন পথের পাথেয় মিলবে কি?…

সুখ কি?

মানুষের সুখ কোথায়? যাই বলি বা করি, যাই ভাবি—সকলেই আমরা সুখের প্রয়াসী। সকল রকম পার্থক্যের মাঝেও একটি সাধারণ জিনিস আছে যাতে সকল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে তা আমাদের সুখাভিলাষ। সমস্ত জীবের সাধারণ প্রচেষ্টার মূলে এই সুখের আকাঙ্খা। জীবনগতি নিয়ামক হয় সুখের সন্ধানে। সুখান্বেষনে চলতে গিয়ে আমরা ভুল করি, ভুলের ফল ভোগ

করতে হয় দুঃখ পেয়ে। প্রকৃতি আমাদের জন্য কতখানি দিতে পারে তার চেয়ে বেশী পাওয়ার অতি আগ্রহেই অনেক ভুল হয়।

সুখী হতে হলে সুখ পেতে হলে প্রকৃতির সর্ব্ববিষয়ে যে বিপরীত (প্রতিকূল, বিরুদ্ধ) দিক আছে তা হিসাব করতে হবে (Opposite that are present in everything in matter)-বহিঃপ্রকৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতিতে; কারণ ভিতরে ও বাইরে ইহা একই রকম। এই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সাম্য বা সুস্থিতি (equilibrium) লাভের প্রকৃষ্ট উপায় আমাদের খুঁজে বার করতে হবে—আমাদের মধ্যে পাশাপাশি বিরুদ্ধশক্তি বা বিরুদ্ধভাব যেমন ঘৃণা ও ভালবাসা, ধ্বংস ও রক্ষা। প্রকৃতির শক্তিগুলি × করে আমাদের তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি কিন্তু মানুষের মন এখনো অনেকের বেলা × বা উপযুক্ত হয়ে উঠে নাই কাজেই আমাদের মধ্যে যে শক্তিগুলি কাজ করছে আমরা তা ×

মনোবিজ্ঞানের চর্চা আজকাল ভালই চলছে। মনোবিজ্ঞানীরা × প্রতিটি ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার বিরোধী (opposite) ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাও থাকে এবং উহাকে স্বাভাবিকভাবেই তৃপ্ত করা (বা পূরণ করা) আবশ্যক। দুই বিরোধী শক্তির কোন একটিকেই বেশী করে চর্চ্চা করা বা উদ্দীপিত করা এবং অপরটি উপেক্ষা করা উচিত নয়। তা করলে প্রকৃতি দুই উপায়ে তার প্রতিশোধ নেয়। অত্যাধিক উদ্দীপিত 'ইচ্ছা' সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং উপেক্ষিত বিরুদ্ধ 'ইচ্ছা' অন্যপথে চালিত হওয়ার পথ খুঁজে নেবে। (negleted opposite wish will try to find out an outlet in a vicarions way) উভয়েই ক্ষতিকারক।...

মানুষের কল্পনায় ভাবাবেগ (emotions) উদ্রেক হলেই সে কাজ করে সে গতীশীল হয়। চারদিকের পরিবেশের (enviroments) মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের যে বাস্তব অবস্থা অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনায় একজনের যে প্রকৃত স্থান তার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই স্বাভাবিক ভাবাবেগ উদ্রেক হয়। বাইরের জগতের সম্পর্কে এবং নিজস্ব আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে মানুষের natural, emotion জাগে-যাহা প্রয়োজনীয় তাহাতে সাড়া আসে-কর্মোদ্দীপনা জাগায় যাহা ক্ষতিকারক তাহা পরিত্যক্ত হয়।...

মানুষের কল্পনার (human emagination) ওপর সিনেমা খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে, অভিনয় ও অন্যান্য যান্ত্রিক কৌশল দ্বারা দর্শকের মন

× চিহ্নিত অংশ পোকায় কাটা।

উত্তেজিত করা হয়—এখানে কৃত্রিম উপায়ে ভাবাবেগ (emotions) উদ্বুদ্ধ করা হয়। **Natural ambition** এর বদলে **artificial emotion** নিয়ে সিনেমা জগতের কাজ। নভেল পড়েও ভাবাবেগের উদ্রেক হয় কিন্তু নভেল পড়াতেও কিছুটা চেষ্টা বা উদ্যম আবশ্যক, এতে পাঠকের আবেগ কিছুটা হ্রাস হয়। ফিল্ম দেখার সময় দর্শক নিষ্ক্রিয়তার কোন প্রচেষ্টা থাকে না; চেষ্টা ছাড়া নিষ্ক্রিয় মনের উপর ছবির প্রভাব খুব বেশী পড়ে—বেশী **emotion** জাগায়। **Film** এর গুরুত্ব মানব সমাজে অনেক বেশী—**Film Producer** দের দায়িত্বও তেমনি অনেক বেশী।

১৯৫৩

১১ই জানুয়ারী : কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর ভারতের কমিউনিস্ট নেতারা ময়দানের সভায় বক্তৃতা দিতে গেলে দেড়লক্ষ লোক তাঁদের বক্তৃতা শোনার জন্য সভায় উপস্থিত হল। কমিউনিস্ট পার্টির দিকে এবার জনতার আশার দৃষ্টি—অন্নবস্ত্রের সমস্যার কি সমাধান তারা দিবে? এই জিজ্ঞাসা তাদের অন্তরে।

২৬শে জানুয়ারী : কমনওয়েলথ বিরোধী দিবসে প্রজা সোসালিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য সকল বামপন্থী পার্টিগুলিই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্রে ২৫ হাজার জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করতে দাঁড়ায়।

২রা মার্চ : কোরিয়া যুদ্ধ রণাঙ্গন থেকে ৪টি আমেরিকার ডেষ্ট্রয়ার গঙ্গার ঘাটে এসে নোঙ্গর করে ১লা মার্চ। হাজার হাজার জনতা গঙ্গার ঘাটে গিয়া (Princesep Ghate) কালো পতাকা উড্ডীন করে। আওয়াজ তুলেছিল—"আক্রমণকারী মার্কিনী নৌ-সেনারা ফিরে যাও" আইজেন হাওয়ার এর মূর্তি (effigy) পুঁড়িয়ে মার্কিন জাহাজের নৌ-সেনাদের অভিনন্দন করা হয়। সশস্ত্র পুলিশ মশাল শোভাযাত্রীদের পথ রোধ করে।

৬ই মার্চ : ৫ই মার্চ পৃথিবীর মহামানব মহান স্তালিন মারা যান। ৬ই মার্চ ভোরবেলা রেডিওতে সেই দুঃসংবাদ আসে। শোভাযাত্রা বেরল—পার্টি অফিসে লাল পতাকা অর্ধনমিত হল। "স্বাধীনতা" ও অন্যান্য দৈনিক কাগজের বিশেষ সংখ্যা বের হল। সহস্র সহস্র পার্টি কর্মী পার্টি দরদী—এবং মহান স্তালিনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি পার্টির শোকসভার শবাধার বাহী শোভাযাত্রার যোগদের।

৭ই মার্চ : ময়দানে সর্বদলীয় সভায় স্তালিনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী দেওয়া হয়।

১৩ই মার্চ : "কাজ চাই" দাবিতে ছাটাই ও বেকারী বিরোধী শোভাযাত্রা ১৫ হাজার মজুর ও কেরানীদের এসেম্বলী অভিমুখে মশাল শোভাযাত্রা।

১লা জুলাই : সুরু হয় বর্ধিত এক পয়সা ভাড়া না দেওয়ায় কার্যকারী প্রতিবাদ।

৪ঠা জুলাই : হরতাল হয়।

১৫ই জুলাই : পূর্ণ হরতাল। পূর্বে এত বড় হরতাল আর হয় নাই। ১৯৪৬ সালের "২৯শে জুলাই" হরতাল সবচেয়ে ঐক্যবদ্ধ সুসংগঠিত হরতাল—এইটেই ছিল এতদিনের কথা। এবারকার হরতাল ঐক্যে, ব্যাপকতায় ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমিকের অংশ গ্রহণে সমৃদ্ধিশালী।

২৮শে সেপ্টেম্বর : খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌছে—৫০ হাজার লোক ময়দানে সমবেত হয়—সেখান থেকে এই বিপুল জনতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দিকে অভিযানের জন্য আগু হতে থাকলে সশস্ত্র পুলিশ 'করডন' তৈরী করে জনতার পথ রোধ করে। পূর্বদিন বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করে। রেল রাস্তা, পায়ে চলার রাস্তা-বাস-সহরাভিমুখে আসার সকল যানবাহন সকল শোভাযাত্রা পুলিশের বাধায় সহরে প্রবেশ করতেই পারে না। এত বাধা সত্বেও ৫০ হাজার লোক জমায়েত হয়। বিধান রায় প্রতিনিধিদের ডেকে ৯ আনা সেরের চাল ৭ আনায় দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়।

১২ই ডিসেম্বর : কাকদ্বীপ কৃষকদের দীর্ঘকালের মামলার অবসান। ১৮ জন মুক্তি পায়। ৯ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

২০শে ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন (ষষ্ঠ সম্মেলন) হয় ১৭ই-২১শে ডিসেম্বর। প্রকাশ্য অধিবেশনে গ্রেট ব্রিটেন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড হ্যারি পলিট বক্তৃতা দেন। এই দিনের ময়দানের সভায় দুই লক্ষ্যের বেশী জনসমাবেশ হয়।

১৯৫৪

১৫ই জানুয়ারী : পশ্চিম বাংলায় কমরেড জ্যোতি বসুকে সম্পাদক করে ৯ জনের সম্পাদকমণ্ডলী তৈরী হয়।

জুলুমের বিরুদ্ধে ২০ হাজার রিক্সা শ্রমিক ৬ দিন ধরে ধর্মঘট চালায়।

২৩ শে জানুয়ারী : বহুবাজার গণতান্ত্রিক যুব সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মিলনীতে কমরেড মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল ; হঠাৎ তিনি মারা যাওয়ায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়। কলেজ ষ্ট্রীট Y. M. C. A. তে সভা হয়।

২৪ শে জানুয়ারী : অমানুষিক অত্যাচারে দাঁড়ি মাঝি ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

২৯ শে জানুয়ারী : সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করে।

৪ ঠা ফেব্রুয়ারী : গজেন মালি সহ ৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে জাস্টিস গুহ রায়ের কাছে আবেদন করা হয়।

৭ ই ফেব্রুয়ারী : মাহিনগর সভা-সাতকড়ী ব্যানার্জির (সাতুদা) মৃত্যু বার্ষিকী সভা। ১৯৩৭ সালে দেউলী বন্দীনিবাসে আটক থাকা কালে মারা যান। সভাপতি-গোপাল হালদার। আমি প্রধান অতিথি, মল্লিকপুর রেল স্টেশন থেকে মাহিনগর অনাথ ব্যানার্জির সাথে।

হরিনাভি শিক্ষকদের সভা, শিক্ষক দাবি ও শিক্ষকদের আসন্ন সংগ্রাম সভাপতি ধরণী গোস্বামী-আমি একজন বক্তা। হরিনাভি রাজপুর হাট এর সন্নিকট।

৯ই ফেব্রুয়ারী : সোভিয়েত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা সভা। কলকাতা নাগরিক সংবর্ধনা কমিটি এবং ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কমিটির পক্ষ হইতে সংবর্ধনা। সন্ধ্যা ৭ টায় বালীগঞ্জ রোডে-তাদের অনুষ্ঠান দেখি।

১০ ই ফেব্রুয়ারী : মাধ্যমিক শিক্ষাকদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মবিরতি। কলকাতায় ৬জন গ্রেপ্তার।

১৭ই ফেব্রুয়ারী : ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-সিভিল লিবার্টি কমিটির পক্ষ থেকে, অসুস্থ ইলা মিত্রের মুক্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম।

১৮ই ফেব্রুয়ারী: ইলা মিত্রের মুক্তির জন্য সিভিল লিবার্টি কমিটির পক্ষ থেকে বিবৃতি—স্বাক্ষর ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অমর বসু, ডঃ ধীরেন সেন এবং আরো অনেকে।

পি. টি. আই এর ম্যানাজারের সাথে আমি দেখা করি। ইলা মিত্রের

সংবাদ প্রচার করার জন্ত অনুরোধ করি। ঢাকা জেলে তার দুরবস্থার কথা, ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি প্রভৃতি দিই।

২১শে ফেব্রুয়ারী: বসন্তপুর শান্তি ও সংস্কৃতি সম্মেলন-আমি সভাপতিত্ব করি। ৭/৮ শত হিন্দু মুসলমান উপস্থিত। হিন্দু-বাগদী, কাওরা, মাহিষ্য ছাড়া অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ উপস্থিত হয়। বসন্তপুর ইউনিয়ন হাওড়া আমতা রেলওয়েব মুন্সিরহাট স্টেসন থেকে পশ্চিমে "পেড়ো"গামী মোটরে ৪ মাইল এর মধ্যে বসন্তপুর। আমতা মহকুমাব আমতা থেকে উত্তরে। ঘোড়াদহ, পিয়ারাপুর, বসন্তপুব থেকে লালঝাণ্ডা সহ কৃষকদের মিছিল আসে। ৯৫% উপস্থিত লোক কৃষক। মঃ ইউসুফ-ভবতারণ ঘোষ। মুন্সির হাট ভাড়া ৯ আনা। মোটরে বসন্তপুর সাত আনা।

২৪শে ফেব্রুয়ারী: নুরুল ইসলাম-ঢাকা। চিকিৎসার জন্ত হাসপাতালে ভর্তি হতে চায়। সত্যেন সেনের চিঠি নিয়া এসেছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী: রবিবার **moved first for Ila mitra's release, later on her transfer to cal, for treatment as soon as she was released on parole : A Deputaion was arranged to meet the pak-Deputy High Commission urging Ila's release on Saturday, the-27th, but the news Published of her Parol release on Friday morning Papers, so the Deputation did not go to meet Pak-Deputy Commissions. The Ila Mitra's release movement for her transfer to cal continued from the 8th February last.**

১৯৫৮

১১ই মার্চ: পাঁশকুড়া থানায় কলাগেছা গ্রামে শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে শান্তি সমাবেশ হয়। সুধীর ও চৈতন্য (কৃষক সন্তান) ১৯৪৯ এর ৯ই মার্চ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। সেদিন রেল-ষ্ট্রাইক হবার কথা ছিল। কলাগেছার কৃষকরা সেই শহীদের বেদী প্রতিষ্ঠা করে প্রতি বৎসর দিবস পালন করেন। এবার এলাকার কৃষক সমিতি তিন দিন ব্যাপী উৎসব করে সভা, শান্তি সমাবেশে। আমি শেষ দিন উপস্থিত থাকি। ৭টার পর সভা— প্রায় ২ হাজার লোক হয়। পাঁশকুড়া থেকে বাসে পুরুষোত্তমপুর, তারপর

হেটে প্রায় ৩ মাইল। কলাগেছা সংগ্রামী কৃষক গ্রাম, এই গ্রামের বহু লোক গিয়েছেন। এখন সরকারী খাজনা বন্ধ করে রেখেছেন।

১৯শে মার্চ: খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শনী হয়। সেই দশদিন ব্যাপী প্রদর্শনীর সমাপ্ত দিবসের সভায় আজ আমি প্রধানরূপে বক্তৃতা দিই। সুবর্ণ জয়ন্তী প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি ডাঃ নরেশ ব্যানার্জী। রাত ১০টার পর বাড়ি পৌছি।

২১শে মার্চ: **Kakdwip** মামলা চালাবার জন্য একটি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের বাড়িতে একটি বৈঠক হয়। আহ্বায়ক কমঃ মুজফ্‌ফর আহমদ, আমাকেও এ বৈঠকে ডাকা হয়। একটি কমিটি গঠিত হয়। হেমন্ত ঘোষাল সেক্রেটারী, কমল বসু কোষাধ্যক্ষ। স্নেহাংশু আচার্য, মুজফ্‌ফ্‌র আহ্‌মদ, ট্রে-ই* সেক্রেটারী, কৃষাণ সভার ভবানী সেন আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লয়ে কমিটি গঠিত হয়। আমি অবশ্য কমিটিতেও নাই। কমঃ কৃষ্ণবিনোদ রায় কাকদ্বীপ, কংসারী হালদারেরও সঙ্গে মামলা পরিচালনা করবেন।

৫ই এপ্রিল: পি সি অফিসে এসে শুনি বাস্তুহারাদের সংগ্রাম ব্যর্থ করার জন্য সরকারী গ্রেপ্তার সুরু হয়েছে, পি· ডি· এ্যাক্ট অনুযায়ী। বাস্তুহারা আন্দোলনকারী নেতারা কারারুদ্ধ অথবা ফেরার। জেলে যাবে কে? **M. L. C.** জাতীয় পার্টির লোক চাই, আমাকেও **P. C. M. in charge** তরফ থেকে বলা হল।

৭ই এপ্রিল: দণ্ডকারণ্যে পাঠানের বিরুদ্ধে বিরাট বাস্তুহারা সমাবেশ ময়দানে। সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদের নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর সদল বলে সংগ্রামে অভিযান ও কারাবরণ।

৮ই এপ্রিল: দুপুরে পি· সি'র লোক যেয়ে বল্লে আজই আপনাকে ময়দানে কারাবরণ করতে হবে। বিকাল ৫ টার ময়দানের সভায় বক্তৃতা দিয়ে ১৫০ নরনারীর নেতৃত্বতায় নিয়া পুলিশ কর্ডন ভেদ করি এবং গ্রেপ্তার হই। আলিপুর লাইনে, পুলিশ লরিতে আমাদের সকলকে দাঁড় করিয়ে রাখে, রাত ১১/১২টায় বারাসাত থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে এক আম্র কাননের পল্লীতে রাস্তার উপর ছেড়ে দেয়। ওখান থেকে বারাসাত

---

* ট্রে-ই—ট্রেড ইউনিয়ন

রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে রাত্রিযাপন করি। ভোরে কলকাতার গাড়িতে উঠি।

৯ই এপ্রিল: সকাল বেলায় শিয়ালদহ পৌছে "স্বাধীনতা" কাগজে দেখি আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা বেরিয়েছে সঙ্গে আমার ফটোও দেওয়া হয়েছে। সারাদিন বাসায় থাকি। সন্ধ্যায় সুনীলের সাথে "মানময়ী গার্ল'স স্কুল" ছবি দেখি।

রাত ৯টায় পি. সি. অফিসে দেখা করতে যাই। রমেন বল্লে সারাদিন নাকি আমার খোঁজ খবর করা হয়—জেলে, লালবাজারে, জেলমন্ত্রী পূরবী মুখার্জির নিকট। রমেন "স্বাধীনতা" অফিসে পার্টি নেতাদের নিকট ফোন করে জানিয়ে দিল যে "সতীশ দা ফিরে এসেছেন।"

২২শে এপ্রিল: ইলা মিত্রকে নিয়া **Indian citizenship Right** মঞ্জুর করার জন্য কালেকটারের অফিসে যাই। ইলা ভারতীয় নাগরিক এর মঞ্জুরী পেল। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক এম এল. সি তাতে সই দিলাম এই মর্মে যে ইলা মিত্র যা লিখেছেন সব সত্য।

২৪শে এপ্রিল: বিজন সেন ও রাজসাহী জেলে নিহত শহীদ দিবসের সভা। অনিল সেনের বাড়িতে ১০১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, আমি সভাপতির আসনে মনোনীত হই।

১৬ই সেপ্টেম্বর: খাদ্য আন্দোলনে ও সংগ্রামে আজ প্রায় পৌনে দু'শ লোক জেলে গেল। গণেশ ঘোষ পার্টির পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেয়। ছাত্ররাও সংগ্রাম করছে।

১৯৫৯

২৩শে ফেব্রুয়ারী: গায়ত্রীকে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ইসলামকে দেখতে গেলাম—তারপর ইলা মিত্রকে।

২৪শে এপ্রিল: রাজশাহী শহীদ দিবস। জেলে গুলিতে নিহত ৭ জন ও নির্যাতনে জীবনাহুতি ১৭ জন। *মোহিত মৈত্র সভাপতি। **বিবেকানন্দ

* মোহিত মৈত্র প্রখ্যাত সাংবাদিক, পরে দেশহিতৈষী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

** বিবেকানন্দ মুখার্জি প্রখ্যাত সাংবাদিক। তখন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

মুখার্জি প্রধান অতিথি। বক্তা সতীশ পাকড়াশী, ইলা মিত্র, মনসুর হবিব,* আরো দুজন। **Student Hall** এ সভা **Hall** ভর্তি হয়ে যায়।

১লা মে: **On a certain may day, R. P. Dutta remarked on the attitude of some intellectuals of middle section in calcutta while com. Dutta was here on tour in India. Intellectuals do not come to tak, much interests on the working class prefer t, meet me on the evening of May day while the workers will rally in your maidan.**

৪ঠা মে: প্রাক্তন নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে (ভারত সভা ভবন) যোগ দিই। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ উপস্থিত ছিলেন।

২৬শে মে: নজরুল ইসলামের ষষ্ঠীতম **(60th)** জন্মদিবসে তাঁহাকে দেখতে যাই।

২৭শে মে: নিবেদিতার** সঙ্গে ফোনে কথা বললাম, সাধনা*** ওখানেই থাকে। ক্ষিতীনের সঙ্গে বিচ্ছেদ আর জুড়বে না। ক্ষিতীনের সঙ্গে দেখা করে কথা বলব কিনা পরামর্শ চাই। নিবেদিতা বলে তা দিদিকে জিজ্ঞাসা করে নিবেন।

২৮শে মে: বিকালে তিব্বত সম্পর্কিত সভা, বক্তা রনেন সেন, হীরেন মুখার্জি ভূপেশ গুপ্ত **and others of M. Forward Block & S. U. C.**

১লা জুন: কাজী নজরুল ইসলামের অপ্রকাশিত বই "ঝরণা" সম্পর্কে কথা বলার জন্য নৌসের আলী**** সাহেবের বাড়িতে যাই। তাঁহার ঘরে এক ঘণ্টা থেকে আলোচনা হয়। কাজী সব্যসাচী ইস্লামও***** তখন সেখানে উপস্থিত হয়।

২৩শে আগস্ট: **To Belghoria** আঞ্চলিক খাদ্য সম্মেলন—দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহুত জনসমাবেশে আমি সভাপতিত্ব করি।

---

* মনসুর হবিব কৃষকনেতা পরে বিধানসভার স্পীকার, পরে আইনমন্ত্রী।

** নিবেদিতা—নিবেদিতা দাস, গণনাট্য সংঘের প্রখ্যাত অভিনেত্রী।

*** দিদি—সাধনা রায়চৌধুরী। গণনাট্য সংঘের প্রখ্যাত অভিনেত্রী।

**** নৌসের আলি অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের স্পীকার।

***** সব্যসাচী ইসলাম নজরুল ইসলামের বড় ছেলে।

১৬ই অক্টোবর: শিল্পী সাহিত্যিকদের বন্যা সাহায্য সংগ্রহ অভিযান সম্পর্কে আলোচনা হয় Cal D. C. তে। সংগৃহিত অর্থ P R C কে দিবে।

২৯শে অক্টোবর: পঃ বঙ্গ রাজ্য পরিষদ'র জরুরী সভা। আলোচ্য বিষয় চীন-ভারত সম্পর্কের গোলমাল ও আমাদের বক্তব্য। ডাঙ্গের বক্তৃতা পার্টি বিরোধী, কেন্দ্রীয় কার্যকারী কমিটিকে তা লিখে জানাতে হবে।

১৩ই নভেম্বর: পাতিপুকুর আই পি টি এ'র বন্যাত্রাণ সাহায্য—টাকা-বস্ত্র-চাল ইত্যাদি নিয়া আসলেম।

২২শে ডিসেম্বর: বিকালে রমা এসে খবর দেয় যে জুনু* আইন অমান্য করে কারাবরণ করেছে। মহিলা দিবসে (20 Dec) আরো দুই শতাধিক মেয়ের সঙ্গে ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজভবনের কাছে ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সি জেলে আছে। আমি রমার সাথে বরাহনগর যাই।

১৯৬৪

৩রা ফেব্রুয়ারী: **W. Bengal P.C. (C. P. I) is restored at a meeting of the members of the State Council convened by Com. Bhupesh Gupta and Govindan Nair. It was dissolved a year ago and P. O. C. formed entrusted with the talk of the W. Bengal party organisation. Now In pursuance of the Central Comm. Resolution Com. Gobindan Nair & Bhupesh Gupta came & convand the meeting the members of the State council (10) members & 3 central Committee members.**

৪ঠা ফেব্রুয়ারী: **P. C. reinstated yesterday held its meeting to day. The two Central Sectt. members were present today also. As the expelled-member Com. Niren Ghosh (Expelled by P. O. C) took his seat in the State Council meeting, the rightists (ex. P. O. C. members & their**

* জুনু—সতীশ পাকড়াশীর বৈমাত্রের মেজবোন (মায়া চক্রবর্তী)। রমা তাঁর প্রথম কন্যা।

supporters) objected his presence in the meeting but it was not excepted by the majority of the Council members. Therefore Com. Bhowni Sen, Somnath Lahiri & some other liked minded Com. Walkeout (17 coms. walked out) Ranen Sen moved that Com. Niren Ghose be asked not to attened the meeting till the Central Committee's approved is recieved. This resolution is outvoted. Centrists Supported R. Sen's resolution. Niren Ghosh is permitted to remain.in the meeting.

২রা এপ্রিল : পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে সকালে রওনা হয়ে দুপুরে নাঙ্গাল এসে খাওয়া সেরে বাসে উঠে ভাকরা পৌছি এবং ফিরে যেতে যেতে সন্ধ্যা শেষে রাত্রি নেমে আসে। রাত্রে নাঙ্গাল ব্যারেজ দেখি; ভোরে উঠেই কুলু-মানালীর পথে যাত্রা করি।

৩রা এপ্রিল : পাঞ্জাব থেকে মানালী ১৬০ মাইল। হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জিলা সহর ও মণ্ডী জিলা সহর হয়ে কুলু; কুলু থেকে 'মানালী'। নাঙ্গাল থেকে সোজা সমতল পথে কিছুদুর যেয়ে স্বরু হয় চড়াই।

পাহাড়ের বুক চিরে পথ ঘুরে ঘুরে উঠেছে কখনো উচু দিকে কখনো নীচের দিকে, গাড়ি উঠে নামে কখনো বা কিছু সমতল রাস্তাও আছে। জঙ্গাল-মিয়া পাহাড় খুব উচু, কম উচু-পথের একধারে উচু খাড়াই আর একদিকে নীচুতে নেমে গেছে খাদ। ডান দিকে নীচু দিয়ে চলেছে "বিয়াস নদী" আঁকাবাঁকা পাহাড়ের উপত্যকায় মাঝদিয়া রাস্তার ডানপাশে অনেক নীচু দিয়া (মণ্ডী পর্যন্ত)। দৃশ্য সুন্দর গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নেও শীতের আমেজ। বিপাশা নদীকে "বিয়াস" নদী বলা হয় এখানে পাঞ্জাবে। কুলু ও মানালী দুটি উপত্যকাই বিপাশা নদীর তীরে। কুলুর দশহরার মেলা বিখ্যাত। ১৫ দিন এ সময় কুলুর উৎসব চলে। গ্রাম থেকে রংবেরং-পোশাক পরে গ্রামবাসীরা আসে-মধ্যযুগীয় পোশাক ও রীতিনীতিতে তারা অভ্যস্ত। তাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বেশ। মণ্ডী হিমাচল প্রদেশের জিলা সহর। পাহাড়ে পাশেই সহর, সহরের অংশও পাহাড়ে উপর উঠে গেছে। মণ্ডী থেকে কুলু। কুলু থেকে মানালীর দূরত্ব ২৩ মাইল। কুলুর উচ্চতা

৪০০০ ফুট। মানালী ৬০০০ ফুট। কুলু মানালী উপত্যকা পূর্বপাঞ্জাবের অন্তর্গত। মানালীর সৌন্দর্য। পাইন বন পাহাড় ঘিরে আছে। পাহাড়ের উপর সাদা বরফ জমে থাকে। বহুদূর থেকে বরফ আচ্ছাদিত শুভ্র পাহাড়ের মাথা দেখা যায়। এখানে প্রচুর আপেলের চাষ হয়। গ্রীষ্মে ও শরতে বিদেশ ভ্রমণকারীরা কুলু ও মালানীতে আসেন। কুলু ফুলের দেশ। বসন্ত ও গ্রীষ্মে বহুফুল ফোটে-চারদিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে। "মানালী" থেকে দুই মাইল দূরে বশিষ্ঠ-কুণ্ড।

মানালী ও কুলুতে প্রচুর দেতার মন্দির আছে। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত-বাসকালে মানালীতে আসেন। এখান থেকে দুইমাইল দূরবর্তী উচু পাহাড়ে যে বশিষ্ঠ কুণ্ডটি আছে, সেখানে নাকি মহামুনি বশিষ্ঠ তপস্যারত ছিলেন ও তাঁর দেহের স্বেদবিন্দু দ্বারা কুণ্ডটি সৃষ্টি হয়। মানালী নামের উদ্ভব হয়েছে ঋষি মণু'র নাম থেকে। এখান থেকে রো:টাঙ্গ গিরিপথে নাকি বিয়াসমুনি তপস্যা করতেন ও সেই তপস্যা স্থান থেকে বিয়াস নদীর উৎপত্তি। কুলুর মত মানালীতেও দশহরা উৎসব জাঁকজমকের সহিত হয়।

৪ঠা এপ্রিল: রাত্রিবাস হোটেলে। ভোরে উঠেই মানালীর দিকে, মানালীতে মধ্যাহ্নে-বশিষ্ঠ কুণ্ড দেখতে যাই। পাহাড়ের উপর উঠতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি—মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ। এক একবার মনে হচ্ছিল আব বুঝি পারা যাবে না। যা হোক উঠলেম উপরে, বশিষ্ঠ কুণ্ড দেখলাম। শত শত সহস্র সহস্র ছেঁড়া জীর্ণ তাবুতে তিববতী রিফিউজিদের দেখতে দেখতে যাই।…সঙ্গী কমরেড "জুলেজুলে" বলে নমস্কার জানাচ্ছিলেন, ওরাও "জুলে জুলে" শুনলেই জিজ্ঞাসু হাসিমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতেন "জুলেজুলে"। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইহা আমাদের "নমস্কার" বা "রাম রাম" বলার মত, তখন আমিও বলতে লাগলেম "জুলেজুলে"।

১৬ই এপ্রিল: বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ দিল্লী থেকে ফিরে এলেন। তাঁদের উপর C. P. I. র শাস্তিমূলক বিধান (suspension) নেওয়া হয়েছে। তাঁরা ৩২ জন সংশোধনবাদী বুর্জোয়া লেজুড় বৃত্তির বিরুদ্ধে, বিপ্লবী মতাদর্শে নূতনভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গাড্ডায় ডুবে গেছে, একে সঠিক পথে দাঁড় করতে হবে-

বর্তমান নেতৃত্বের ও তাদের দুর্নীতির পথের অবসান ঘটাতে হবে। তারা মস্কোর সংশোধনবাদী পার্টি নেতৃত্বের ইঙ্গিতেও উৎসাহে।

২৩শে এপ্রিল : আগামীকাল **Suspended P. C leader** দের অস্থানে যে **State Council meeting** বসবে-কে কে যোগ দিবে, কারা এখন যে স্বীকার করে নিবে না, এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন অনেকে। **Rightist** তো আসবেই না, এ মিটিং ডাকার অধিকার প্রমোদ দাশগুপ্ত জ্যোতি বসু বা মুজফ্‌ফর আহমদ কাহারো নাই। ডাঙ্গের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব **Suspend** করেছে। কিন্তু তবু তাদেরই আহ্বানে মিটিং হচ্ছে আগামীকাল। সংখ্যাধিক বামপন্থীরা উৎফুল্ল তারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মানবেনা। মধ্যপন্থীরাও সভায় যোগ দিবে কিন্তু সকলেই কি যোগ দিবে ? কাগজে তিনজন এ মিটিং বর্জন করার বিবৃতি দিয়েছেন-সত্যেন মজুমদার, নির্মাল্য বাগচী ও দেবেন দাস।

৯ই মে : বামপন্থী প্রাদেশিক কমিটির ডাকে ময়দানে প্রথম সভা। যাঁরা দিল্লীতে ডাঙ্গে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রস্তাব করে পার্টি মিটিং থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন (১১/৪/৬৪)। পরে বাংলায় এসে তারা রাজ্যসভা ডেকে ভারতের ৩২ জন নেতার বেরিয়ে আসা সমর্থন করেছেন (২৪/২৫শে এপ্রিল) তাঁরাই ময়দানের সমাবেশের নেতা ও উদ্যোক্তা। সহস্র সহস্র জনসমাবেশ হয়। পার্টির সভ্য, দরদী ও সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কেরানী, ছাত্র মহিলারা ছিলেন। সভাপতি মুজাফর আহমদ। বক্তা জ্যোতি বসু, প্রধান বক্তা রামমূর্তি। প্রায ৬৫ হাজার লোকের এই সমাবেশে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। রামমূর্তির বক্তৃতায় লোক উদ্বুদ্ধ হয়েছে, ডাঙ্গে পন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচুর যুক্তি শুনে তাদের সংশোধনবাদী নীতির প্রতি জনগণ সম্পূর্ণ বিমুখ হয়েছে বলে মনে হয়। আমি ইচ্ছা করেই আজকের মিটিং-এ **Dias** র উপর উঠে বসি।

২৬শে অক্টোবর : **W. B. state party conference ended to day after few delibaration,...Newstate committee consisting of 39 memb & 3 control committee members are elected (I am chosen & formall elected as a member of the control commision)**

৩০ শে অক্টোবর : আজ অতি ভোর রাত্রে পুলিশ এসে আমাদের কমিউন* থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়—মুজফ্‌ফর আহমদ হরেকৃষ্ণ কোঙার ও যামিনীভূষণ মজুমদার**। আরো বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তারের খবর আসে। পার্টি সেক্রেটারী প্রমোদ দাশগুপ্ত, সেক্রেটারিয়েট মেম্বার সমর মুখার্জি, নিরঞ্জন সেন ও অন্যান্যরাও ধৃত। সকালে বেলা ১০ টা নাগাদ P. C. মেম্বারদের নিয়া জরুরী পরামর্শ সভা করা হয়। পার্টি কংগ্রেসের দায়িত্ব বিভিন্ন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। জ্যোতি বসু, সরোজ মুখার্জি-সেক্রেটারিয়েট মেম্বারদ্বয় পি· সি· সভা পরিচালন করেন। কলকাতার পার্টি কংগ্রেসের কাজ ভণ্ডুল করার জন্যই এ-গ্রেপ্তার। স্থির হল কংগ্রেস হবেই।

৩১ শে অক্টোবর : গতকাল মোট ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেল। পরে ২৯ জন দাঁড়ায়, গ্রেপ্তারের সঙ্গে আজ সপ্তম পার্টি কংগ্রেস কলকাতায় আরম্ভ।

৫ই ডিসেম্বর : তিনজন central com. member-এর গ্রেপ্তারের ফলে ৩ জন নূতন লোক C.C. তে পাঠানো স্থির হয়। মুজফ্‌ফর আহমদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্থলে আবদুল্লাহ রসুল, সরোজ মুখার্জি, ও গনেশ ঘোষের নাম নির্বাচনে স্থির হয়। তখনই কেবল ভোট হয়।

১১ ই ডিসেম্বর : **another batch of six arrests have been made : Sudhangshu Das Gupta (দেশহিতৈষী), Sudhangshu Palit (Cal. D. C. Sectt)' Dinesh Majumder (student leader), Susital Ray (writer guide to দেশহিতৈষী), Jamini Shaha (M. L. A) M. A. Latif (prof advocat), Pijush Das Gupta of N. B. A.**

---

* কমিউন=৬১ কড়েয়া রোড। এখানে থাকতেন—কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, হরেকৃষ্ণ কোঙার, গণেশ ঘোষ, সতীশ পাকড়াশী, রামাশঙ্কর প্রসাদ, শান্তিময় গুহ।

** যামিনীভূষণ মজুমদার, পঃ দিনাজপুর জেলার পার্টির সম্পাদক ও এম· এল· এ·

১৯৬৫

পুরুলিয়া জেল

৩রা জানুয়ারী ১৯শে পৌষ : **I am arrested very early in the morning at 61 karaya Rd. Calcutta-19 (4 A M) later to Gokhal Rd. S.B. office, kept there all day long & later to Howrha Station in the evening. I am esscorted to Purulia by Purulia Fast passenger train leaving Howrah at 9 P. M. reaching Purulia early in the next morning.**

৮ই ফেব্রুয়ারী : আজ নন্দিতা*-শান্তি ও জুহু দেখা করতে আসে।

১২ই ফেব্রুয়ারী : আজ আমাদের উপবাস, মোট ১৫৭ জন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী : হরিদাস মালাকার আজ বদলী হওয়ায় আমরা এখন ১৪ জন হলেম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী : ডঃ শরদীশ নিজ জনের অসুখের জন্য সিউড়ী জেলে বদলী হলেন। এখন আমরা ১৩ জন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী : ডাঃ শরদীশ রায় ফিরে আসেন। আবার ১৪ জন হলেম।

১৮ই ফেব্রুয়ারী : পুরুলিয়া জেল থেকে বদলী হলেম।

প্রেসিডেন্সি জেল

১৯শে ফেব্রুয়ারী : প্রেসিডেন্সি জেলে সকালে পৌছলাম। পুরুলিয়াতে যাদের ছেড়ে এলাম : ডাঃ শরদীশ রায় এম. পি, শান্তশ্রী চ্যাটার্জী, জলেশ্বর হাসদা, সুচাঁদ সরেন ও লক্ষণ বাগদী, এই তিনজন এম, এল. এ। মহাদেব ব্যানার্জি, সুনীল বসু রায়, সুনীল ভট্টাচার্য, কেষ্ট হালদার, সন্তোষ দেব, লক্ষ্মীনারায়ণ (of khagpur) পশুপতি হাজরা, মেথর খাঁন। প্রেসিডেন্সি জেলে এসে যাদের পেলাম—ডাঃ মৈত্রী বসু, প্রশান্ত শূর, শচীন সেন, সুশোভন রায় চৌধুরী, অলোক বসু, শ্যামল রায়, জীবন মুখার্জি, সুবীর নস্কর, বিশু দাস, মধু বাগ, সত্য নারায়ণ চন্দ, অক্ষয়

---

* নন্দিতা—সতীশ পাকড়াশীর বৈমাত্রেয় বড় বোনের কন্যা। এর সাথেই তিনি শেষ জীবনে একসাথে ছিলেন, শান্তি, নন্দিতার স্বামী।

ঘোষ ও জুডন গাঙ্গুলী (১৩ জন) এর মধ্যে ৮ জনের জেলবাসের অভিজ্ঞতা নেই।

২৩শে মার্চ: সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুটুদি মারা যান। জেলে বন্দী ৪ জন সাথী করপোরেশন নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন সংবাদ এল সন্ধ্যায়। অলোক বসু, ডাঃ হৈমী বসু, প্রশান্ত শূর, শচীন সেন।

৩০শে জুন: বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসি।

১৩ই জুলাই: কমরেড জ্যোতি বসু এবং যতীন চক্রবর্তী (এম.এল.সি) দেখা করতে আসেন।

২৪শে জুলাই: লণ্ডন থেকে আরতি রায়* চিঠি দিয়েছে জানতে পারলাম। চিঠি আটকায়, দেয় নাই।

১লা আগস্ট: জেলে এসে দেখি মাত্র কয়েকজনেব শান্ত সে বন্দী শিবির আর নাই, ট্রাম আন্দোলনে বহুলোক বন্দী—জ্যোতি বসু আবদুল হালিম, যতীন চক্রবর্তী, সুবোধ ব্যানার্জী, সত্যানন্দ ব্যানার্জী এরূপ আরো মোট ৪৮ জন।

১১ই সেপ্টেম্বর: শিপ্রা ভৌমিক** (ডি আই আর ছাত্রীবন্দী) মুক্তি পেলেন আজ।

২৩শে সেপ্টেম্বর: নাট্য শিল্পী খ্যাতনামা উৎপল দত্ত বন্দী হয়ে এলেন।

১৯৬৭

২৯শে জানুয়ারী: আজ সন্ধ্যায় উত্তর বেলেঘাটা ইলেকশান মিটিংয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত (P. C. Secretary) K. G.*** আরো কে কে আহত। K. G, হাসপাতালে গেছেন। চন্দন নামে এক ছেলে ছুরিতে আহত, প্রমোদ দাশগুপ্তের মাথায় ইট মারে, মাথা ফাটে এবং অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তবু আঘাত গুরুতর নয়।...বাটার নির্বাচনী কাজকর্ম দেখে ফিরে এলাম সন্ধ্যায়।

---

* আরতি রায় (দাশগুপ্ত) সতীশ পাকড়াশীর বিশেষ স্নেহের পাত্রী। শ্রমিকনেত্রী, সি. পি. আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য।

** পরে শিপ্রা চক্রবর্তী, মহিলা নেত্রী বর্তমানে মৃত।

*** K. G.—কে. জি, বোস। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী নেতা। এম. এল. এ। বর্তমানে মৃত।

৩০শে জানুয়ারী : বিপ্লব ও আরতির* বাড়ি যেয়ে দেখা করে এলাম। তারা আজই চলে যাচ্ছে। দিল্লী থেকে প্লেনে লণ্ডন যাবে। ১০০ টাকা দিয়ে গেল নির্বাচনী ফাণ্ডে।

২রা ফেব্রুয়ারী : দাক্ষিণদারী ১৭ নং রে নিম্ন মধ্যবিত্ত পূর্ববঙ্গবাসীদের বৈঠক, প্রায় ১০০শত লোক রাত ৯টা অবধি আমার বক্তব্য শুনে তরুণ সেনকে বিধানসভায় ও ইস্মাইলকে লোকসভায় নির্বাচিত করার আবেদন জানাই। শ্রোতারা প্রায়ই বাবুর হাটের আশপাশের লোক। আমাকে অনেকেই জানে। বৈঠকে বামপন্থী কমিউনিস্ট (মাঃ) প্রার্থিদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল। সভা শেষে ৫নং রে বটুক হালদার এর বাড়িতে যাই। গরম গরম আলুভাজা, আলু পেঁয়াজ ভাজা ও তাজা মাছের ঝোল ও গরম ভাত খুব ভাল লাগে। তারপর ১ মাইল জীবন মাষ্টারের সঙ্গে হেটে রাত ১১ টায় বিধু-চিনুদের** বাড়িতে শুই।

৫ই ফেব্রুয়ারী : উলুবেরিয়ার অন্তর্গত। নবগ্রাম সভা। প্রায় এক হাজারের বেশী কৃষক ও মধ্যবিত্ত সাধারণ লোক ছিলেন। বিধানসভার প্রার্থী কমরেড বটকৃষ্ণ দাস (শিক্ষক) লোকসভায় কমঃ শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। দীর্ঘ সময় এক এক বক্তা বক্তৃতা দেওয়ায় লোক অধৈর্য হয়। ছেলেরা নাটক সুরু করার জন্য উদগ্রীব ছিল। ...সবশেষে আমাকে বলতে দেওয়া হয়—অধৈর্য লোক গোলমাল করতে থাকে। মিটিং তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়ে নাটক আরম্ভ করা হলে লোক শান্ত হয়। রাত্রে এক মণ্ডল (ডাঃ অরুণ বসুর আত্মীয়) বাড়িতে থাকি—খাওয়ার ব্যবস্থাও তারাই করেন। নবগ্রামে এই প্রথম কমিউনিস্ট সভা।......

১১ই ফেব্রুয়ারী : মধ্যগ্রামের নিকটবর্তী গঙ্গানগর সভা, বিধানসভার প্রার্থী ডাঃ শৈলেন দাস এম. বি. রাজারহাট নির্বাচন কেন্দ্র। সভায় প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত অধিকাংশ বাস্তুহারা মধ্যবিত্ত অল্প সংখ্যক মুসলমানও ছিল।

---

* বিপ্লব—বিপ্লব দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ছাত্র নেতা সি. পি. আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য আরতি'র স্বামী।

** চিনু (নিহার কণা ভট্টাচার্য) সতীশ পাকড়াশীর বৈমাত্রেয় ছোট বোন। বিধু (বিধুভূষণ ভট্টাচার্য) চিনুর স্বামী।

১২ ই ফেব্রুয়ারী: ডাঃ প্রশান্তর* প্রেরিত মুক্তার মালা (?) আজ তার হাওড়ার বাড়িতে ওর দাদা জয়ন্ত রায়কে দেওয়া হল।

১৪ই ফেব্রুয়ারী: বরাহনগরে কৃষ্ণপদর সঙ্গে হেটেই কালীতলা মাঠে উৎপল দত্তের "দিন বদলের পালা" দেখতে যাই। অনেকখানি রাস্তা হেটেই গেলাম, ভীড়ে বাসে উঠা কঠিন বুঝে হেটে হেটে যাই। শীতের গরম কাপড়ের প্রয়োজন বোধ করে নাই অন্যেরা। আমি গায়ের চাদরটা নিয়া যাই। রাত প্রায় ১০ টায় কিছুদূর খুব কষ্ট করে হেটেছি।

১৮ই মার্চ: শ্যামসুন্দরকে** আমার লেখার **correction slip** পাঠাই **through** কাটু বসু (সুনীল বসু) পাঠালেম আজ সকালে।··· গণেশ ঘোষকে আজ সকালে ও অপরাহ্নে মিটিং করার জন্য তাগিদ দিই। শহীতুল্লা সাহেব 21st তারিখে পারবেন না জানালেন। 22nd, 23rd-ও পারবেন না। গণেশ ঘোষ এরপর দিল্লী চলে যাবেন। সুতরাং এখন আর বসা হল না।

২রা এপ্রিল: 'অনুশীলন প্রীতি সম্মেলন' সকাল ১১ টার মধ্যে ঢাকুরিয়া থেকে সেণ্ট এণ্ড্রুজ স্কুলে প্রীতি সম্মেলন ক্ষেত্রে পৌছি। রবি সেন, নলিনী ঘোষ, নলিনী গুহ ছিলেন। সুধীর দত্ত (of Barisal), সরোজ চক্রবর্ত্তী, পতু ঠাকুরতা, জগদীশ চাটার্জি, সতীন্দ্র রায়, শীতল দে, দুর্গেশ ভট্টাচার্য, মিহির। মন্ত্রীদ্বয়—নিরঞ্জন সেন ও ননী ভট্টাচার্য, কৃষ্ণবিনোদ রায়ও ছিলেন। প্রমথ ভৌমিক বাবু মানু (ফটোগ্রাফার)-কে নিয়ে যায়। আমার ফটো নিল। 'কালান্তরে' বের করার জন্য বোধ হয়। প্রমথবাবু বল্লেন—একটা জীবন, কাল লেখা বের করব। ধীরেন মুখার্জিকে দেখলেম। ধীরেন বাবু নিজেই খোঁজ করে দেখা করেন। এখন নাকি তিনি হিন্দ মোটরের (**Hind motor**) ম্যানেজার। হরিভূষণও পথে আসে। প্রায় সহস্রাধিক লোক (**Ex Annushilons**) সমাবেশ।

---

* পি. আর. সির' একজন অগ্রণী কর্মী ও ডাক্তার। ইংলণ্ডে আছেন।

** শ্যামসুন্দর—শ্যামসুন্দর দে—কবি।

৩রা এপ্রিল : গতকাল অনুশীলন প্রীতি সম্মেলনে আরও যাদের দেখি, গুরুদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ চক্রবর্তী **of Barisal** ভূপেশ গুহ **of Barisal, Radhika Banerjee and many others.**

১২ই আগস্ট : **Lake gardens** থেকে বিপ্লব দাস ও আরতির দেওয়া ৫০ টাকার চেক নিলাম। ৭ই আগস্ট নীল সেন **Post** করেছে চেকটা, আরতিরা লণ্ডন থেকে ওকে লিখেছিল।

১৫ই সেপ্টেম্বর : "কমরেড" কাগজের "সম্পাদক" হওয়ার অনুমতি আজো পাওয়া গেল না। এখনো **Secry**-র মত নেওয়া নাকি হয় নাই।

২২শে সেপ্টেম্বর : বাবলু * এসেছিল "কমরেড" কাগজের সম্পাদক কে হবে তা নিয়া কথা বলতে। আমি কিছুই জানি না। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য নাকি বলেছে তোমরা তো আমাকে ডিঙ্গিয়ে উপরে গিয়াছ। আমি খোঁজ নিয়া জানতে যাব কেন সম্পাদক সম্বন্ধে কি হল। আমার মনে হল। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য নিজেই সম্পাদক হতে চায়।

৩০শে সেপ্টেম্বর : **Bablu comes to give one advertisment for their "Comrade" puja issue, but it would not be published in "Ganashakti" daily because it is not known what its vewes & what it will publish. No party Committee No EC take responsibility for this "Comrade". It is not a party paper Lakshen Bhattacharjee said that it was not their paper. So Com. P. Dasgupta does not agree.**

২২শে ডিসেম্বর : বিকালে রমা এসে খবর দেয় যে জুযু আইন অমান্য** করে কারাবরণ করেছে। মহিলা দিবসে (**20 Dec**) আরো দুই শতাধিক মেয়ের সঙ্গে ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজভবনের কাছে ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সি জেলে আছে।

---

* বাবলু—কৌশিক বসু। ভাগ্নি রমার স্বামী।

** প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভা বাতিল ও নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রফুল্ল ঘোষ, কয়েকজন এম এল. এ. কে নিয়ে, কংগ্রেসের সমর্থনে মন্ত্রীসভা গঠন করে।

১৯৬৮

৮ই জানুয়ারী : বংশাল কোর্টে জুমুর মামলার তারিখ, জুমুকে সঙ্গে নিয়া আমি ও কৃষ্ণপদ* কোর্টে যাই। আমার শ্বাস-কষ্ট ছিলই, অতি কষ্টে গেলাম। ১০ টা—৫টা অবধি কোর্টের ঠাণ্ডা বারান্দায় সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকি। সেদিন খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। জুমুর case আবার তারিখ পড়ল।

২৫শে ফেব্রুয়ারী : অনুশীলন সমিতির বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতি ও খাওয়া। ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা হল বহু পুরানো সাথীর সঙ্গে।

১৩ই মার্চ : সন্ধ্যায় কাশীপুর "শহীদ দিবস" সভায় বক্তৃতা। রাত্রে বরাহনগর যাপন (মশার কামড় অনিদ্রা সারারাত) (বক্তৃতার উত্তেজনাও ছিল বোধ হয়)

২০শে এপ্রিল : শহীদ স্মৃতি কমিটির সভা হয় ডাঃ নরেন ডিস্‌পেনসারীতে ডিহি শ্রীরাম রোডে। নরেন রায় কোষাধ্যক্ষ, কালীপদ দাস সম্পাদক ও আমি উপস্থিত হই। সুকুমার সেনকে আসতে বলা হয়, তিনিও আসেন আর কেউ না।

২৪শে এপ্রিল : পাকিস্তান শহীদ স্মৃতি দিবসের সভ student Hall য়ে করা হয়। বক্তা প্রমথ ভৌমিক, অরুণ চৌধুরী, মনসুর হবিব, ফটিক রায় এবং প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আমি। কালিপদ দাস প্রস্তাব পাঠ করে। নরেন রায়, নির্মল মৈত্র, সণ্টু ভাদুড়ী ও ননী সেনরা উদ্যোগ আয়োজন করে।

১লা জুন : বিকালে শ্যামসুন্দর ও জয়াদি** আসে। বিংশ শতাব্দীতে আমার লেখা আর নেবে না—তারা কাগজটাকে সিনেমা ও যৌন তত্ত্বের কাগজ করে ফেলেছে। সমরেশ বসু সম্পাদক হচ্ছেন।

১০ই জুলাই : আজো বৃষ্টি ছিল। আমি P. C. meeting য়ে যাই একটু দেরীতে—১০ মিনিট লেট হই। শিয়ালদহ থেকে জল কাদায় হেটে যাই। ট্রাম অচল থাকে। মধ্যাহ্নে রুটি মাংসের ব্যবস্থা হয় সবার জন্য, খেয়েই আবার সভার কাজ আরম্ভ হয়। রাত ৮ টায় শেষ হয়. বৃষ্টি

---

* কৃষ্ণপদ—কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। প্রাক্তন বিপ্লবী। জুমুর স্বামী।

** জয়াদি—শ্যামসুন্দর দেব'র মা।

পড়ছিল গুড়ি গুড়ি। ট্যাকসিতে শিয়ালদহ। উল্টাডাঙ্গা থেকে বাসা পর্যন্ত জল ও কাদা পার হয়ে যাই। sandle পায়ে ছিল।

৮ই ডিসেম্বর : **P. C meeting** হয়। **I am degraded from P. C. M-ship Control Committee not be elected according new constitution. P. C. consist of 33 members. Some of 10 P. C. M. are left out while there are newly taken.**

২৯শে ডিসেম্বর : আমরা ৬ জন আজ সকালে গাড়ি করে কোচিন দেখতে বেরোই। নিরঞ্জন সেন, হরপ্রসাদ চাটার্জি, সরোজ মুখার্জি, গোলকপতি বাবু (শিক্ষক) রমেন সেন ও আমি। আরব সাগর, বন্দর, কোচিন বাজার, বাড়ির আসবাবপত্র ছবি, **Bedging** ও খাটিয়া ইত্যাদি দেখি। ভাস্কো ডি গামার কবর স্থান যে বাড়িতে তা দেখি।

১৯৬৯

৩১ শে জানুয়ারী : সুনীলের* সঙ্গে তার অফিসে দেখা করতে যেয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ও উত্তেজনার সম্মুখীন হই। আকস্মিক দাঙ্গার খবর একান্তই অজানা ছিল। ট্রাম বন্ধ হয়ে যায়—বাসও ক্রমে বন্ধ হতে থাকে বা পথ ঘুরে কিছু যেতে থাকে। সুনীল আমাকে এক রকম জোর করেই ওর বাসায় পাঠিয়ে দেয় তাও অন্যরুটের এক বাসে চেপে দেশপ্রিয় পার্কে যাই। রাত্রে থাকি।

৩রা ফেব্রুয়ারী : খরদহ কল্যাণনগর ... ীর বিয়েতে যাই। বর আড়াই হাজারের। আমাদের কমরেড, মোহিনী মি... বিয়ের পূর্বে আমি দেখি মালতি...

১৪ ই ফেব্রুয়ারী : নরেন রায়ের ... যাই পূর্ববঙ্গ ভাষা আন্দোল... পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। ... সঙ্গেএ বিষয়ে আলোচনা...

* সুনীল—সুনীল দা...
পাকড়াশী তাদের...

১৯শে ফেব্রুয়ারী : সোদপুর গণনাট্য* সংঘের একটা ব্রাঞ্চ হতে আসে "নৌ-বিদ্রোহ-দিবসে"র বৈঠকে আমাকে নিয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ হয়।

বিদ্রোহীরা নাকি বোম্বাইয়ে 'কংগ্রেস' "লীগ" ও "কমিউনিস্ট" অফিসে যায়-প্রথম দুই অফিসে প্রত্যাখ্যাত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি নাকি **Peace** বা শান্তির বাণী প্রচার করে। কলকাতায় **Peace Procession** বেরিয়েছিল [অর্থাৎ কমিউনিস্টরা বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে আসে নাই। সভায় পঃ বাংলার প্রাদেশিক গণনাট্য কমিটির কমরেড আশু সেন এ-কথা বলেন]

১৫ই আগস্ট : "শিক্ষা নিকেতন" বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব ও সুকান্ত জন্মোৎসব। সভায় আমি বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যাই। স্কুলটি উল্টাডাঙ্গার কিশোর বাহিনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। প্রশান্ত চাটার্জি পৌর কাউন্সিলার, আমি, কৃষ্ণ চক্রবর্তী ইত্যাদি কয়েকজন বক্তৃতা দেন। গান হয়। দিলীপ দাশগুপ্ত শিক্ষা নিকেতনের সম্পাদক।

৪ঠা সেপ্টেম্বর : সকালে শুনি নিরঞ্জন সেন মারা গেছেন। বিকালে কেওড়াতলা শ্মশানে যাই তখন নিরঞ্জনের দেহ পুড়ে যাওয়ার শেষ অবস্থা। প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হল। মন্ত্রী প্রভাসবাবু* শ্মশান থেকে আমাকে বাড়ি পর্যন্ত দিয়া গেল বৃষ্টি হচ্ছিল।

২৭শে সেপ্টেম্বর : নিরঞ্জন সেনের মা ও স্ত্রীকে দেখার জন্য বিনয় দাসের সাথে একত্রে নাকতলা যাই।

১৯৭০

৬ই জানুয়ারী : **P. C. office** যে যাই সেদিন প্রমোদ দাশগুপ্তকে বলি (আমি ও নির্মল মৈত্র) শহীদ দিবসে (ভাষা) আমাদের সভায় প্রধান

---

* গণনাট্য সংঘের সোদপুর শাখা ছিল না। ছিল পানিহাটি শাখা, পানিহাটি-সোদপুরে অবস্থিত।

** প্রভাসবাবু—প্রভাস রায়। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র ২৪-পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সেচ মন্ত্রী। বর্তমানে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী।

বক্তা হতে স্বীকার করেন। যামনী সাহাকে Plenam এ আমার থাকার ভাল ব্যবস্থাব কথা বলি।

১৭ ই ফেব্রুয়ারী : নন্দরাণী ডাল। (মেদিনীপুরের এম. এল. এ) এর বিয়ের শুভরাত্রি।

২ রা এপ্রিল : Latter to Com. Soroj Mukherjee asking for the P. c. dicision ref. Pension. Taking of the Ex-Andaman pl. Prisoner. I mention the name of 10 such Whole time Comrades Who may ask for allowance if permitted by P. C. I write first to P. Das Gupta, secry, to the P. C. in 27·3·70·

৯ ই এপ্রিল : রনজি স্টেডিয়ামে "লেনিন শতবার্ষিকী উৎসব" প্রথম দিবসের অনুষ্ঠান দেখতে যাই। জ্যোতি বসু উদ্বোধন করেন, এক ঘণ্টারও বেশী বক্তৃতা দেন। পরে "গান্ধী ও লেনিনবাদ" সম্বন্ধে বলেন শহীদুল্লা সাহেব।

১১ ই এপ্রিল : To P. C. Allowance for the Andaman prisoners "Will not be accepted by the Comredes" that's the disision.

২৩ শে জুলাই : বিপ্লবী নিকেতনে মহারাজ সম্বধনা। ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী মহারাজ বক্তৃতা দিলেন। ভূপতি মজুমদার সভাপতির ভাষণ দিলেন (সংক্ষিপ্ত)। সাধারণ বক্তাদের মধ্যে আমাকেই বলার জন্য সর্বপ্রথম ডাকা হয়। আমি মহারাজের মূল আদর্শের প্রতি সমর্থন জানিয়ে, আমি যে নীতিগত মত পোষণ করি যদিও পৃথক, মহারাজের সহিত এর নীতিগত পার্থক্য আছে। সমাজ অধঃপতনের পথে যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল দুর্নীতিপরায়ন এ আমি স্বীকার করি। কিন্তু অধোগতির ধারার বিরুদ্ধে একটা নূতন force উঠেছে-উঠবেই।

১৭ ই অক্টোবর : পুরী যাত্রা। কৃষ্ণপদ ও স্বপন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে পৌছে দেয়। রাত্রি ৮ টায় পুরী এক্সপ্রেস গাড়ি ছাড়ল। সঙ্গে যাত্রী হল সুনীল, ছবি, রতীশবাবু তার স্ত্রী রাঙু, কন্যা দেবী ও গোপা।

—রাত্রে প্রায় ৪ টায় শ্বাসকষ্ট, কাশী আরম্ভ হয়। অনেকক্ষণ অবধি কষ্ট পাওয়ায়, 2nd tier থেকে নেমে নীচে 3rd tier এ আমাকে মাথা উচু

করে বসার সুযোগ করে দেয়। সুনীল ছবি মিলে 2nd tier এর Bunk নামায় বেলা ১০ টায় পুরী পৌছি। আমার শ্বাসকষ্ট ও দুর্ব্বলতা তখন বেশী। প্লাটফর্ম থেকে রিক্স অবধি দুতিনবার বসতে হয়। ১০½ টায় স্বর্গদ্বার বালিসাহী বীরেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি (টুম্পার ঘর) পৌছি। বাকী সারাক্ষণ শয্যায় কাটাই।

২৩ শে অক্টোবর: কাশি ও টান সকালে একই প্রকার আছে। সকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ক্রমশঃ রোদ উঠে। সমুদ্রে স্নান করতে যায়, তীরে বসে তাদের ও শত শত লোকের স্নান দেখি। সমুদ্রের হাওয়ায় বসাও আমার কাজ। আমি অক্ষম সমুদ্রস্নানে যে জোর লাগে, ঢেউয়ের সাথে যুঝতে হয়, তাতে আমার টান উঠে যাবার আশঙ্কা। আর টান উঠলে, উঠে আসতে পারব না, এই ভাবনা। বিকালে আজ একাই লাঠি ভর দিয়া সমুদ্রতীরে হাওয়া খেতে যাই। ২ ঘণ্টা হাওয়া খেয়ে ফিরে আসি।

২৬ শে অক্টোবর: সুনীল ছবি ও অন্যান্যদের সাহায্যে আজ আমার সমুদ্রস্নান। অনেক কষ্টে প্রায় হাঁটু জল অবধি যাই। তারও কম জলই হবে। সাধারণ ঢেউয়ের নীচে ডুবতেও পারি নাই। স্রোতের টানে আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। শ্বাসের টান উঠে যায়। তাড়াতাড়ি তীরে নিয়ে আসে সাথীরা। আজ রতীশ কর (দেবী ও গোপার বাবা) কলকাতায় ফিরে যায়।

—সমুদ্রতীরে ২ ঘণ্টার উপর বসি সন্ধ্যায়।

২৮ শে অক্টোবর: আজো সমুদ্রে স্নান করতে নামি কিন্তু স্রোতের টান কঠিন বোধ হওয়ায় উঠে পড়তে বাধ্য হই, আমার হাঁপানীর টান খুব বেড়ে যায়।

—বিকেলে প্রায় ২ ঘণ্টা সমুদ্রের তীরে বসি। টান একই রকম আছে, যদিও আজ ১১ দিন পুরীতে বাস

৩রা নভেম্বর: সন্ধ্যায় ওরা সকলে কলকাতায় রওনা হয়ে গেল। রাত্রে আমি একা বাড়িটা ফাঁকা একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। সুনীল, ছবি, রাণী দেবী ও গোপাদের কলকোলাহল আর নাই। কেউ খেতে ডাকল না। দুধ রুটি খেয়ে কাটালেম। দোকানের দুধ যেমন রুটিও তেমনি। সব কিছুর উপর আজ রাতে আমি একা।

৬ ই নভেম্বর: গতকাল উপবাস। ভাত না খেয়ে থাকার জন্য দুর্ব্বলতা বেশী।

সুতরাং হোটেলে যেয়ে খাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর এবং ঠিক হবে না। কবরেজ পত্নীকে বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। সিদ্ধ পেঁপের তরকারি ও একটু অন্য তরকারি বেঁধে নিয়ে আসলেন আমার ঘরে। আমি তৃপ্তির সহিত খেলাম।

—সমুদ্রতীরে আড়াই ঘণ্টা—

৭ই নভেম্বর: আজ দুর্যোগের ৩য় দিন, ঝড়ো হাওয়া, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে বৃষ্টি ও গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি, দিন রাত্র এই অবস্থা। ঘরের বার হবার উপায় নেই। কবিরাজ পত্নী মধ্যাহ্নে খেতে দেন তাই রক্ষা। কিন্তু চাল-তরকারী কিনে এনে দেওয়ার সুযোগও পাই না।

—কলকাতার খবর পাচ্ছি একমাত্র যুগান্তর পত্রিকার মাধ্যমে। প্রতিদিন নকশালী তাণ্ডব বোমা-ছুরি-হত্যা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী গুলি হতাহত ও গ্রেপ্তার। নকশালীরা সেদিন আমাদের K. G. Bose এর স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীকে স্কুলের ভিতর যেয়ে ছাত্রীদের ভিতর থেকে বার করে ছুরী মারে-ছাত্রীদের চোখের উপর। এছাড়া আরো হতাহত হচ্ছে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতায়। স্কুলে, বাসে, ট্রামে, আগুন ও বোমা, মূর্তি ভাঙ্গা ও সংঘর্ষ বাধান-এই সব কাণ্ড। সমাজ বিরোধী গুণ্ডারাও স্বাধীনভাবে বা নকশালদের সাথে মিলে।

১৫ নভেম্বর: সমুদ্রতীরে দেড় ঘণ্টা। বেশ ঠাণ্ডা লেগেছে। গরম চাদর গায়ে দিয়াও শীত বোধ হয়েছে। সোয়েটার না নিয়া আসা ভুল হয়েছে। কবিরাজ পত্নী শ্রীমতি নিলীমা সেনগুপ্ত চমৎকার রান্না করে, আমি তৃপ্তিতে খাচ্ছি আজ ১০ দিন ধরে।

১৬ই নভেম্বর: সমস্যা উপস্থিত:—(i) শশাঙ্ক সান্যালের বাড়ির একটা অংশ আজ খালি হয়ে গেছে। আমাকে যেতে হবে ওখানে।

(ii) শান্তির চিঠি পেলাম, টাকা হলে সে আসতে চায়। তার লিখানুযায়ী আজই প্রমোদ দাশগুপ্তকে লিখলাম আবার শান্তি লিখেছে টুকলুর পরীক্ষা হতে নভেম্বর মাস লেগে যাবে। তার মানে শান্তিদের আসবার ব্যবস্থা হবে কিনা তা ঝুলছে অনিশ্চয়তার মধ্যে।

(iii) সাধনা ঔষধালয় থেকে কতকগুলি ঔষধ কিনে আনলাম, তা খাওয়া; অনুপান এবং পথ্য, কি করা কি হয়। আমাদের কবিরাজ বল্লেন এ

আপনার পক্ষে ঠিক ঠিক প্রযোজ্য নয়। সাধনা ঔষধালয় থেকে বাজার করতে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার অভিমুখে ধীরে ধীরে হেঁটে যাই। বিস্ময়ে ভাবি ৫৬।৫৭ বৎসর পূর্ব্বে পুরী এসেছিলাম মহারাজার × সঙ্গে। তখন জগনাথের মন্দির দেখি। তখন স্বর্গদ্বার ছিল, আজও তাই।

(vi) রমা লিখেছে বাণীর বিয়ে ২ রা ডিসেম্বর আমাকে যেতে হবে।

১৯শে নভেম্বর : আজ থেকে **ocean view Hotel**-এ খাওয়া আরম্ভ হল—একবেলা করে। এই হোটেলের ম্যানেজার শ্রীনীরেন রায় শশাঙ্ক সান্যালের লোক, ইনিই পার্শ্ববর্তী সান্যালের বাড়ির **care taker**। আজ এই হোটেলে ভালই খেলাম। চার্জ বোধ হয় অনেক হবে—পাঁচ টাকা একদিন ২ বেলা হওয়ার সম্ভাবনা। ঠিক জানি না, আমাকে ম্যানেজার বল্লেন (আমি টাকার কথা উঠাবার পর) সে হবে'খন।

শান্তিরা আসবে কিনা না জানায় সমস্যায় পড়েছি।

কলকাতায় হত্যাকাণ্ড, ছোরা, বোমা, গুলি অব্যাহত আছে।

২১শে নভেম্বর : **Ocean View Hotel-3rd Day**। আজ বানরী পাড়ার মনীন্দ্র গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে দেখা হল। আমি আছি খবর পেয়ে সে আসে। পতু ঠাকুরতার ভাই আমার পূর্বেকার সন্ত্রাসবাদী যুগের সাথী।

শীত পড়েছে খুব, কিন্তু আমি শীত কাপড় ছাড়া আছি।

সমুদ্রতীরে মিনিট দশেক কম ২ ঘণ্টা। এত ঠাণ্ডা পড়ে ৫ টার পূর্বেই যে ৫ টা ১৫ মিনিটের পর আর থাকা গেল না

—বেশ নিরিবিলি আছি। স্নান খাওয়া রোদ পোহানের অপূর্ব সুযোগ, আর ঔষধ খাওয়া, খবরের কাগজ ছাড়া আর বেশী কিছুই পড়ি না—আলসেমী।

২২শে নভেম্বর : খুব শীত পড়েছে। ৪½ টার পরই সমুদ্রতীরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। ৫ টার তা তীব্র হলে আমাকে উঠে আসতে হয়। আজ সমুদ্র তীরে ৩টা ১৫ মিঃ ৫টা। পথে মুনীন্দ্র গুহ ঠাকুরতার বাসায়। ওর বৌদিও ছিলেন। ঝালকাঠির ডাঃ দেবেন্দ্র গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী। এই বিধবা বৃদ্ধ মহিলা তাদের বাসায় পতুর সঙ্গে গোপনে দু তিন দিন আমাকে কত কি খাওয়াতেন চর্ব্যচুষ্য লেহ্য দিয়ে। ডাঃ দেবেন বাবু যুবক তার যুবতী স্ত্রী আজ অতি বৃদ্ধা বিধবা চোখে প্রায় দেখে না। মনীন্দ্রও ৬০

বৎসরের বেশী এবং বেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছে। খুব ধর্মপ্রাণ। পুরীতীর্থে আছে তাই সান্ত্বনা। স্ত্রী ছেলে মেয়ে নাই।

১লা ডিসেম্বর: পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী Ocean view হোটেলের ম্যানেজার নীরেন রায়ের নিকট থেকে চাবী নিয়া শশাঙ্কবাবুর বাড়ি যাওয়া ঠিক হয়। কিছু জিনিস নিয়ে ওখানে রেখে এলাম। বিকালে রিক্সা করে bedding suit case ইত্যাদি নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এমন সময় নীরেন বাবু মধ্যাহ্ন কালে হোটেলে গেলে বল্লেন, শশাঙ্ক বাবুর স্ত্রী চিঠি দিয়াছেন—সতীশ বাবু তো নভেম্বর মাসে থাকবার কথা এবং তাকে ১৫ দিনের খাওয়া খরচ দিতেও কথা হয়েছিল। এখন তিনি ও বাড়িতে থাকলে, আমার অন্য লোক যাওয়ার কথা। এ মাসের প্রথম দিকেই যাবে। নীহার বাবু এ কথা বলাতে আমি আর ও বাড়িতে না যাওয়াই স্থির করি। যা রেখে এসেছিলাম তা ফিরিয়ে নিয়ে এলাম আমার বর্তমান থাকার স্থানে। অর্থাৎ বিপিন বাবুর বাড়িতে। হোটেলেও এখন থেকে আমি charge দিয়ে খাব 2·50 per meal এক রকম খাই।

৮ই ডিসেম্বর: মনীন্দ্র capsule কিনে আনে, ১৬ দিন যাবত রোজই খাচ্ছি। ভাত পথ্য করলাম তিন দিন বার্লি বা চিড়ার জল খাওয়ার পর। কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী রান্না করে যত্নের সহিত সিদ্ধ ভাত খাওয়াছেন। আলুসিদ্ধ পেপের ঝোল। বা হাতটা অচল। নড়া চড়া করলেই ব্যাথা লাগে। —আজ পঃবঙ্গে হরতাল। শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল হয়েছে। পুলিশ ২২ স্থানে গুলি চালিয়েছে। কিছু হয় নাই।

১০ই ডিসেম্বর: আজ নন্দিতা, শান্তি, টুকলু, পিকলু ও বিভা এল সকাল ৮ টায়। আমি আজো কবিরাজ পত্নীর রান্না সুপ্ত ভাত ও সিদ্ধ পক্ক খাই। আজ ৩য় দিন এখানে পথ্য খেলাম। অতঃপর নন্দিতারা এসে গেল এখানে কবিরাজ পত্নীর রান্না আর দরকার হবে না। হোটেলে খাওয়াও বন্ধ। গতকাল রক্ত পড়া বন্ধ। আজ পায়খানাও বন্ধ। ঔষধ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে। পূর্বে ৫ দিন কিংবা ৪ দিন ভীষণ অসুস্থ হয়ে ছিলাম।

—পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মুজিবর রহমান খুব বেশী ভোট পায়।

১৩ই ডিসেম্বর : 77 years complete's—begines 78th year দুই রিক্সা করে আমরা পুরী সহর পরিভ্রমণ করলেম—আসলে পুরীর মন্দির ও আশ্রম দেখাল। চক্রতীর্থ ঝাউ বন এলাকা ঘুরে সন্ধ্যায় ফিরে এলাম শান্তি নন্দিতা, টুকলু, পিকলু, বিভা ও আমি। পড়ে যেয়ে বাহাতের হাড়ে যে ব্যাথা হয়েছিল তা আজো আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। হাতটা দিয়া কিছু করা যায় না একটুতেই তীব্র বেদনা লাগে—হাতটি অচল।

২৭শে ডিসেম্বর : আগামী রবিবার সন্ধ্যায় Howrah Express এ কলকাতায় ফিরছি। ১৮ই পৌষ ১৩৭৭ সালে ইং ৩রা জানুয়ারী ১৯৭১। সমুদ্রতীরে পৌনে দুই ঘণ্টা। বিভা অসুস্থ। পর পর মন্দির থেকে প্রসাদ এনে খাওয়া। গত কাল গুঁড়া দুধ দিয়ে পায়স তৈরী করে খাওয়ার পরে বিভার বদহজমী ও পেটের অসুখ। আজ জল দিয়া ভাল খেল।

আর ৪ দিন আছি, ৫ম দিনে রওনা হচ্ছি কলিকাতায়।

১৯৭২

৮ই জানুয়ারী : আজ এ বছরের সব চেয়ে বেশী শীত। আমার মত ৭৯ বছর বয়সের বৃদ্ধ, ৫ পাঁচ বছরের ক্রনিক ব্রনকিয়েল এজমা রোগীর পক্ষে জীবন অতিষ্ঠ। কেমন আছি একে একে দেখতে আসে দিব্যেন্দু, দেবু ও নির্মল মৈত্র। আমি কিন্তু বেঁচে আছি—মরি নাই যদিও আহত হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছি।

১১ই জানুয়ারী : রাত্রে ব্যথা তীব্র, বাম দিকে, শ্বাসটান কষ্টকর হয়। শেষ রাত্রে টান বাড়ে বুকের ব্যথাও তীব্র হয়। গতকাল সকালে ডাঃ প্রশান্ত চাটার্জি এসে B. P দেখতে। আজ সকালে ডাঃ অমিয় বসু আসেন আমাকে দেখতে। heart specialist সঙ্গে আসে ডাঃ নরেশ ব্যানার্জি। অমিয় বাবু বুকের ব্যথা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা—দেহ পরীক্ষা করলেন, B. P. দেখলেন। মনে হয় বেশী রক্তের চাপ। বুকের ব্যথাটাই প্রধান রোগ। অর্থাৎ heart effect করেছে বলে সন্দেহ করেন। আমি মোটেই এটা বুঝি নাই। heart অবধি গেলেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। নূতন Prescription লিখে দিলেন, নির্মল মৈত্র তখনই তা P. R. C তে দেখিয়ে ঔষধ ও Hot water bag আনার জন্ম নিয়া গেলেন।

নিঃ মৈত্রও সঙ্গে এসেছিলেন, ঐ prescription fallow করতে হবে, অন্য সব ঔষধ বাদ দিতে হবে। অমিয় বাবুর নির্দেশ। ডাঃ প্রশান্তকে সপ্তাহে ২ দিন এসে chek up করে রিপোর্ট দিতে হবে।

১৪ই জানুয়ারী : সকালে তীব্র টান উঠে ১১ . ৮ ঘণ্টা খুব ক্লেশ দিয়াছে। বুকের ব্যথাটা আছেই সামান্য কিছু কম। আরো অচল হয়ে পড়েছি। ঘরেও চলা ফিরা করতে পারি না'ই।

২২শে জানুয়ারী। মুকুন্দ কাকা আসেন সন্ধ্যায় মুজিবর রহমানের* সঙ্গে দেখা করতে চান আমাকে সঙ্গে নিয়া। আমি তো মুজিবর রহমানকে চিনি না, সুতরাং আমার সঙ্গে গেলে কিছু হবে না। মুকুন্দ কাকার ঢাকার বাসায় মুঃ রহমান রাত্রে শুতেন খেতেন অনেক পূর্বে

২১শে ফেব্রুয়ারী : শহীদ ময়দানে আমাদের বাংলাদেশ শহীদ স্মৃতি সমিতির ভাষা আন্দোলনের সভার আয়োজন P. C ও cal. D. C র চেষ্টায় ভাল সভার অধিবেশন হয়। বামপন্থী কংগ্রেস বিরোধী দলের প্রত্যেক পার্টি থেকে একজন বক্তৃতা দেন। আমি সভায় সভাপতী। প্রথমে প্রস্তাব ১টি পাঠ করেন ও সামান্য একটু ব্যাখ্যা করেন। মনসুর হবিবুল্লা প্রস্তাব সমর্থন করে একটি ছোট সুন্দর বক্তৃতা করেন। সুধাংশু চৌধুরীর হেপাজতে আমাকে তার বাসা হয়ে নিয়ে যায় এবং ফিরিয়ে দিয়ে যায় বাড়িতে।

—প্রফেসার অমলেন্দু দেকে আমার ১টি বই দিই, ঐ সভার দিন ময়দানে। বাড়িতে বেশ গরম পড়ে।

২৩শে মার্চ। আমার বই বিপ্লবী স্মৃতি কথা শান্তির মারফতে পাঠান হল, P R C তে প্রমথ বাবুর নিকট। প্রমথ বাবু কি জানি কি করে ডাঃ প্রশান্ত রায়কে বইখানা পাঠিয়ে দেবার জন্য চেয়ে নিলেন।

—গত কাল (২২শে মার্চ) গভীর রাত্রিতে একদল পুলিশ p R C তল্লাসি চালায় ও ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে। (এই খবর একটা নূতন খবর)।

২৪শে এপ্রিল : ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশ শহীদ স্মৃতি দিবস। আজ সুধাংশুর বাড়িতে light & fan ছাড়া কাটাতে হয়েছে, আজ শহীদ স্মৃতি দিবসের সভা হয় অজিত সেনের প্রেসের ভিতর। ভবানীপুর হকার্স কর্মারের

---

* মুজিবর রহমান—বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতি।

নিকট। প্রকাশ্য ভাবে সভা করা সম্ভব হয় নাই। প্রেস ঘরের ভিতরে তিল ধারণের স্থান ছিল না। কাগজে বা চিঠিতে মিটিং-এর স্থান ঘোষণা না করেও এত বেশী লোক হয়। হল ভাড়া করে মিটিং করলেও বেশ মিটিং হত। আজ কাল শহীদের নামে সভা ডাকলে লোকের জমায়েত খুব বেশী হয়। আমাকে পৃথীশ তাহার গাড়িতে নিয়া যায় এবং ফিরিয়ে দিয়ে যায়। জুনু ও কৃষ্ণপদও সঙ্গে যায়।

১৮ই আগষ্ট : রাধারমন মিত্র* এলে তাকে আমার লিখা বই একখানা দিলাম। আমিই তাকে আসতে খবর দিয়েছিলাম। তিনি খুশী মনে বইখানা নিয়া গেলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর : বর্ধমানের মৃত সুবোধ চৌধুরীর শোক সভা রামমোহন লাইব্রেরী হলে। আমাকে সভাপতি করে সভার উদ্যোক্তারা। চট্টগ্রামের লোক ও বর্ধমানের নেতৃস্থানীয় থেকে কমরেড গণেশ ঘোষ উপস্থিত, বক্তৃতা দেন। আমি সবার শেষে বলি? মিটিং ভাল হয়। **Prof Santi Roy** বক্তৃতা করেন।

২৩শে অক্টোবর : সকালে পবিত্র গাঙ্গুলী** আসেন, আমাদের অতীত পার্টি আন্দোলনের কথা, তার লক্ষ্য ও কাজ ইত্যাদি ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে দেওয়ার জন্য। একজন **prof, Dr Raghubir Sinha** চান ভারতের পূর্ব বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে বই লিখবেন।

৮ই নভেম্বর : আমি আজ ৮ই নভেম্বর লিখছি, ২০শে নভেম্বর আমার বয়স ৮০ বৎসর পূর্ণ হবে।

১লা ডিসেম্বর : মধ্যাহ্নে ঘুমাতে ঘুমাতে পরে ঝিমান শুরু হবে ঝিমাইবার পর অকস্মাৎ বিছানার চৌকী থেকে মাটিতে পড়ে যেয়ে ব্যথা পাই মাথায় ও কোমরে।

২রা ডিসেম্বর : আজও আবার মধ্যাহ্নে বাইরের উচু চৌকী থেকে পড়ে যেয়ে দারুণ ব্যথা পাই। মাথা প্রায় কেটে যায়। কোমরে — ডান কোণে ঘাড়ের ডান পায়ের কোমরের নীচে হাড়ের মধ্য পা টানতে লাগে।

---

* রাধারমন মিত্র—প্রাক্তন বিপ্লবী। মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী। 'কলকাতা' গ্রন্থের লেখক, একাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত।

** পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক।

চিঠি

শ্রীমতী জুহু*
৩৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সতীশ পাকড়াশী, রাজবন্দী
বক্সা স্পেশাল জেল
পোঃ বক্সা-দুয়ার
জিঃ জলপাইগুড়ি
তা: ২৩ শে আগষ্ট, ১৯৫০

জুহু

সেদিন এখানেও দুবার ভূমিকম্প হয় রাত ৮ টার পর ও রাত ৩ টার পর। কাগজে দেখছি ব্যাপার গুরুতর; আসাম প্রদেশের উত্তরাঞ্চল বিধ্বংস হয়ে গেছে।

যোগমায়া ও বীরেন বাবু**ছেলে-পেলে সহ কোথায় কেমন আছে জানার জন্য আমি উদ্বিগ্ন। শীঘ্র একখানা কার্ড লিখে আমাকে তাদের কথা জানাও এবং তাঁদের ঠিক নাও লিখে দিবে। ঐ দুর্ঘটনার পর বীরেন বাবুর কোন চিঠি পেয়েছ কিনা জানাবে।

মা ও ক্ষিতীশ***কে থায় আছে ছেলে-মেয়ে সহ তোমরা ভাল আছ আশা করি।

তোমার বড়দা
সতীশ পাকড়াশী
ডেটিনিউ।

* জুহু—(মায়া চক্রবর্তী) বৈমাত্রেয় মেজ বোন। পরবর্তীকালে তাঁরা বরাহনগরে বাস করে। পার্টি সভ্য, মহিলা নেত্রী-২৪ পরগনার

** যোগমায়া—(ডাকনাম-বিভা) বৈমাত্রেয়-বড় বোন, তাঁর স্বামীর নাম বীরেন ভট্টাচার্য

*** মা—বিমাতা। ক্ষিতীশ বৈমাত্রেয় ছোট ভাই।

শ্রীমতী জুহু
৮৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সতীশ পাকড়াশী-রাজবন্দী
বক্সা স্পেশাল জেল
পোঃ বক্সা-দুয়ার
জিঃ জলপাইগুড়ী
৩০ শে আগষ্ট ১৯৫০

স্নেহের বোন জুহু

তোমাদের চিঠিপত্র কিছুদিন যাবত পাই না। তোমরা সকলে কেমন আছ তাও বুঝিতেছি না। বর্ষা অবিরাম বর্ষা ও ভূমিকম্প নিয়া আমরা আছি। বাইরেও নাকি চলছে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ইত্যাদি। খবরের কাগজের মারফত নিত্য নূতন সঙ্কটের খবর পাই। মানুষের জীবন বুঝি আজ অতিষ্ঠ !! বিভা ছেলে পেলে সহ আসামে আছে জানি না কি তাদের দুর্গতি। তোমাকে ওরা কিছু লিখেছে কি? উত্তর আসামেই ভূমিকম্পের প্রকোপ বেশী 'বিভা'দের জন্য আমি চিন্তিত। শীগগীর লিখে জানাবে তাদের কোন খবর পেলে কিনা। আমি তো ওদের ঠিকানা জানি না নইলে লিখতে পারতাম। মালতীরাও আসামের লামডিং অঞ্চলে থাকে। সেখানে ততটা গুরুতর অবস্থা হয় নাই বলেই মনে হয়।

তোমরা ছেলে মেয়েদের নিয়া কেমন আছ—কিভাবে সংসার চলে—দারুণ দুর্মূল্যের দিনে সাধারণ মধ্যবিত্তদের যে কি কঠিন অবস্থা তা তো ভালই জানি। মুকুন্দ কাকা মাঝে মাঝে চিঠি লিখেন। মা ও ক্ষিতীশের খবর জানাবে।

এখানে গেল পনেরো দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলছিল; কাল ও আজ কিছু রোদ ছিল। এখন রাত্রিতে আবার প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি নাকি আরো বেশ কিছুদিন চলবে। ভূমিকম্পের কাঁপুনি আমাদেরও নাড়া দিয়া গেছে। রমা, বাণী ও শ্রীমান সমীরকে আমার স্নেহ ভালবাসা দিবে। ওদের বাবাকে আমার প্রীতি ভালবাসা জানাবে। তুমি আমার স্নেহ জানবে। তোমাদের শরীর কেমন আছে লিখিবে।

তোমাদেরই সতীশদা।

গায়ত্রী — ৬/১:/৫৫

কলিকাতা

উত্তর দিচ্ছি তোমার লেখার—লিখেছ প্রায় দুই তিন খানা চিঠি দিয়ে একটারও উত্তর পাও নাই আমার নিকট থেকে, তাই ভেবেছিলে 'আপনি বুঝি এই ক্ষুদ্র মানুষটিকে ভুলে গিয়েছেন।'

দু-তিন খানা চিঠি আমাকে লিখেও উত্তর পাও নাই জেনে বিস্মিত হলেম। ভাবলেম সে চিঠিগুলি গেল কোথায়-আর যাবেই বা কেন, আমি তো একখানাও পাই নাই। তোমার চিঠি পেয়েও জবাব দিই নাই এমন তো হতে পারে না গায়ত্রী, আমি নিজে সকল সময় চিঠি লিখিনা-লিখিতে পারি না কিন্তু চিঠি পেয়ে উত্তর দিই না তা আমি তো কবি না গায়ত্রী। হতে পারে উত্তর দিতে দেরী হয়ে যায় কখনো কখনো সময়ের অভাবে। গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম দ্বিতীয় সপ্তাহে তোমার জবাব পেয়েছিলাম সেই জবাবের জবাব দিই নাই। —তারপর দু'মাস আর কোন চিঠি লিখি নাই। সেই দীর্ঘ ফাঁক দেখেই হয়তো তোমার মনে হয়েছিল আমি ভুলে গিয়েছি। ভুল হয় না কিন্তু। চিঠি না লিখলেও মনের শিখায় তোমার থাক, প্রিয়জনের কথা কি ভুলা যায় !! এই তো সেদিন কাশীতে কত আদরে যত্নে তোমাদের মাঝে ছিলাম, যখন কাজের চাপে থাকি অথবা শারীরিক অসুখে দুর্ভোগের মাঝে পড়ে থাকি তখনও তো তোমাদের কল্যাণ হস্ত আমাকে যে সাহায্য করেছিল, তা মনের ভিতর ভুলে থাকা যায় না।

আমার দ্বিতীয় কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তুমি লিখেছ, 'প্রতিমা-আসে, (বিজয়ার দিনে) আবার বিসর্জন হইয়া যায়। কিন্তু আমি যে আসিয়াছি কবে বিসর্জন হব তা জানি না। আমার বিসর্জন হইতে পারিলে তবে হয় শান্তি।'

জীবনে বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাই সত্য ও সুন্দর। বাঁচার জন্যই আমরা জন্মিয়াছি। বেঁচে থাকার পথে দুঃখ ভাবনা থাকে। অশান্তি আসে—তা বলে জীবন বিসর্জন দিতে চায় কে ? দুঃখ অশান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই কর্তব্য ও কর্ম—পবিত্র কর্ম। একে বলে বেঁচে থাকার সংগ্রাম—জীবন সংগ্রাম। হতাশার কাছে মানুষ হার মানবে কেন ? জীবনে হার স্বীকার করব না—পরাজয় মেনে নিব না এই মনোভাবই তো বীরত্বের মনোভাব—সাহসের

মনোভাব। দুর্বল যে দুঃখের আঘাতে সে ভেঙ্গে পড়ে। সবল যে সকল দুঃখ-অশান্তির সঙ্গে সে সংগ্রাম করে লড়াই করে—। পরাজিত হয়ে সংসার থেকে বিদায় নিতে চায় না। বাঁচতে চায়; বাঁচার সংগ্রাম করে। পরাজয়ের বিরুদ্ধে জয়ের সংগ্রাম-মরার বিরুদ্ধে জীবনের সংগ্রাম। এখানেই জীবনের ঐশ্বর্য—মানুষের মহত্ব। কষ্টে দুঃখে শোকে পাঁজর ভেঙ্গে যাওয়া মানুষ আবার দাঁড়িয়ে উঠে বলে, "জীবন যুদ্ধে হারলে চলবে না, কিছুতেই না।" শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের জয় হবেই সংগ্রামই সৌন্দর্য। যে ছেলে মেয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট সয়েও নিজের মহান লক্ষ্য ছাড়ে না সে জয়ী হয় লোকের শ্রদ্ধা ভালবাসা পায়। আমরা বিপ্লবীরা জীবনপণ করে সংগ্রাম সুরু করেছিলাম, অন্যায় অবিচারের কাছে মাথা নত করব না, পরাজয় স্বীকার করব না হতাশ হয়ে যাব না। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করব তাতে যদি মরণ আসে মরণকে বরণ করেই জীবনের পথে চলব। এমনি সঙ্কল্প নিয়েই জীবন পণ করে দুঃখ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে জীবনের সংগ্রামে এগিয়ে চলেছিলাম। সংগ্রামই সুন্দর, সংগ্রামের সৌন্দর্যই মানুষকে সংগ্রামের উৎসাহ জোগায়।

বাড়িতে সংগ্রাম, স্কুল কলেজ সংগ্রাম, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে যে অন্যায় অবিচার আছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজের পুরানো ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সর্বোপরি রাষ্ট্র ব্যবস্থার ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেই মানুষ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এবং এভাবে সংগ্রাম করে করেই সাফল্য আনবে। জয়লাভ করবে। ইহা একান্ত সত্য। কবির কথায় -

সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব—।

গঙ্গার ধারে বারে বসে সন্ধ্যাকালে তোমার মুখে যে কথা শুনতেম্ আজও সেই কথা কেন গায়ত্রী, সেই হতাশার কথা, সেই জীবন বিসর্জনের কথা।

তখনো আমি তোমার এই কথার বিরুদ্ধে বলেছি, আজো সেই কথাই বলি-সেই কথাই বুঝাই। ধৈর্য ধরে শিক্ষার পথে—বুঝা ও জানার পথে চলতে থাক। দিন আসবেই—সুদিন।

আমি তোমাকে স্নেহ করি, ভালবাসি—তোমার বুদ্ধি ও কাজ দেখে আমি

খুশী হয়েছিলাম। তোমার দাদাদের নিকট বলেছিলাম। গায়ত্রী গুণবতী* ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। ও কিন্তু ভবিষ্যতে ভালমেয়ে হয়ে উঠতে পারবে, আমার এ চিঠি বারবার পড়ে এর মর্ম্ম বুঝতে চেষ্টা করবে—এই চিন্তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবে। পরাজয়ের মনোভাব, বেদনার স্বর যেন তোমার লেখায় আর না ফুটে উঠে—

তোমাদের মামা—

* ২৪ পরগণার-উদয়পুর-নিমতা অঞ্চলের কামাখ্যা ভট্টাচার্যের বোন। এই পরিবারের সাথে সতীশ পাকড়াশীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সতীশ পাকড়াশী
এম. এল. সি

৮৪/৩ রিপন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৬
১৪/১২/৫৮

To

Shri Gogesh chandra chatterji
convener of the Confercnce of old Revolutionaries
166 South Avenue, New Delhi.

Dear friend,

Old revolutionaries are meeting in Delhi to chalkout a plan for writing the history of their own activities contributing much to the Freedom movement of India. It is no dout a tandable task that should have been taken up long ago. Some of our veteran comrades died and some facts have fallen into oblite ration. However as the main outlines of the revolutionary movement in India cannot be forgotten-the history of the movement based on these outlines may be written. History should and must have a place for the revolutinary struggle for liberation of India with a view to fulfil this much oleastered idea the organisers of the conference have done well in taking initiative of calling a conference of old revolutionaries.

I am sorry I shall not be able to attend the conference owing to my old age and sickening health—severe cold of Delhi will not suit me at this age of 64/65,

Many respectable Persons and heroes of the glorious old revolutionary days will, I think, attend the conference,-those whom I respected and admired for thier heroic revolutionary activities-whom I adored for thier secrifice suffering,-whom follewed as pilgrimage to the battlefield of Freedom.

I am extremely sorry not be to attened & meet these notable parsons gathering in Delhi although I overcomed of meeting

them with devotion dwelling my youthful days and also for nearly to twenty-five years of my imprisonment and detention.

Here I am placeing, with all humility, some suggestions

(1) chronological narration of facts and systematic development of movements in the conpi'ation of the revolutionary history will, of course, be made. The names of different revolutionary Parties & Groups and their organisational methods cannot be ablitered from the history, but each of their struggles & actions should not be placed against its party names—should not be shown separately, except as General chronological narrations mentioned above (It can be easily understood why it is so).

(2) Besides narrations of facts the analysis of the historical and Socio-political background that caused the birth of the Swadeshi movement in Bengal in 1905, and, the subsequent militant youth movemenet Baptised with the the Patriotic fire of armed revolution, must be made in the compilation of history of the revolutionary struggle for Freedom.

(3) The class-positions of the revolutionaries should also be ascertained and why they took to arms for liberation of the country,—why only the middle class youths joined the movement—why only the intelectual middle class supported the movement directly & indirectly,—why the masses at people were leftout at the movement ?

(4) The hazy political and economic objective of the then freedom movement and the ideal of an imaginary bright future inspired the youths to take up arms and ambrace death at the gallows. In this hazy and imaginative view there is one most specific & definite abjective,—the objective of driving the Britishers out of India and establishing Independence of our motherland & bringing about peace and happiness of the People. For this noble ideal youths of the secret societies sacrified there

lives faced death bravely ; but unfortunately that objective has not yet been fulfilled in its entirety. why is it so ?

(5) The revolutionary movement was primarily anti-imperialist and anti-colonial and for liberation of India form British imperialist Rule.

Later on during nineteen twenties when the impact of the Russian Revolution roused the people of Asia and dependent colonial contries the revolutionaries in India organised "Hind-usthan Socialist Revolutionary Army" (H. S. R. A). Many revolutionary sacrificed their lives at the gallows & in the Prisons in India & Andamans & face bullets during the armed battle, for bringing about Freedom & Socialism in India

The history of the revolutionary movement is a part & parcel of people's movement and it is to be noted as such and this revolutionary movement was the national movement of India in the early period of the movement for long 25 years from 1895 to 1920.

Hoping success of the conference of Revolutionaries.

with Greeting
Satish pakrashi

১৩ ও ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে ভারতের বিপ্লবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয। বিপ্লবী ইতিহাস রচনার জন্য নিম্নলিখিত ১৩ জন বিপ্লবীদের নিয়ে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়, ১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি) ২। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩। নলিনী কিশোর গুহ, ৪। ডাঃ খান খোঁজে, ৫। সরদার সোহন সিং ভাকনা ; ৬। লালা হনুমন্ত সহায়, ৭। গুরু মহারাজ প্রতাপ সিং ৮। ডঃ যাদু গোপাল মুখার্জি, ৯। পণ্ডিত সুন্দরলাল ১০। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ১১' হরিকুমার চক্রবর্তী, ১২। হেমচন্দ্র ঘোষ, ১৩। যোগেশচন্দ্র চাটার্জী (আহ্বায়ক)

সম্মেলনে সভাপতি হন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। সহ-সভাপতি লালা হনুমন্ত সহায়।

ভাষণ দেন—পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, যোগেশ চাটার্জী, সুরেন ঘোষ, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, লালা হনুমন্ত সহায়, সোহন সিং ভাখনা (গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা), বিজয় সিং (লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার), সুনীতি (দেবী) চৌধুরী (কুমিল্লা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা মামলার), ভগবান দাসজী, শিউ শর্মা, অরবিন্দ বসু, শচীন বকসী, রামদুলারী ত্রিবেদী (কাকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলার), বারীন ঘোষ, ঝারখণ্ডে রায় (ইউ. পি. বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা)।

বাংলা থেকে ১৫০ জন সম্মেলনে যোগ দেয়।

[চিঠি হাতেলেখা কপি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ফলে কিছু ভুল থাকার সম্ভাবনা আছে—শান্তিময় গুহ]

To Sree G. L Nanda
Union Minister of
Home offairs, New Delhi

Presidency Jail
Calcutta
25/2'65

your recent statement against left-communist you have accused me & some of my friends for going to "kulu" on a sight-seeing visit. Not only did I (we) go there I had also shown keen desire, as your infer in your statement, to go to "kulu" ; this is your indictment against me & my friends. Now kulu is an ideal healths-resort with its beautiful scenerioes & cool climate. All sorts of people including Govt lumimaries go their for a change or for enjoying holidays amidst the blossoming flowers. We had been there for a day or two, of course it is natural that we should have keen deseir to go to see this well shown Place theries nothing wrong in going there. Your over-zealous inteligence Dept. has conveyed to you this piece of newes (secret news ?) our pleasure-trip to kulu and you have taken it as a valuable confidential information from your 'yesman' entrusted to look after the security of the country.

No doubt you olso knew of our tour Vakra-Nangal Hydro-Electric Dam. You have delibartely avoided to mentions this place of our tour in your statment of indictment against the left-communist (consedering it would not serve your Perpos). You have selected "kulu" hilly-region (one of our tour spots) as the place where we did go because that would suit your purpose of imparting on impression about our intention of going to proximity to the Frontier.

The fact is that we did go to Jullandar (punjab) to attend a conference of old revolutionary freedom fighters inagurated

by the Panjab Gaddhar party revolutionaries. From there we went to see the near by pleces of Impɔrtance, before left for calcutta–such as Vakra-Nangale & kulu. Your statment Re. this our to "kulu" is a deliberat distortion and insima tion, and unworented infereace, you imfute motive whoes there is none.

Hope you will direct to release me forth with.

your faithfuly
S. Pakrashi
Ditenu. DJR.

---

* ১৯৬৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দা পার্লামেন্টে, বাম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করে বিবৃতি দেয়, তাতে সতীশ পাকড়াশী প্রমুখদের 'কুলু' ভ্রমণকেও উল্লেখ করা হয়। তার প্রতিবাদে কমরেড সতীশ পাকড়াশী এই চিঠি লেখেন।

চিঠি হাতে লেখা কপি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে' ফলে কিছু ভুল থাকার সম্ভাবনা আছে– শান্তিময় গুহ।

Sri Shamsunder De
(my most Intimate Friend)

Satis Pakrashi DIR
Political detenu
Presidency Jail
Calcutta-27
24.1.66

প্রিয় শ্যামসুন্দর

কেমন আছে শরীর ও মন। কবিতা রচনা ঠিক ঠিক চলছে নিশ্চয়ই। মাসে মাসে মাসিক পত্রে নবীন কবির কবিতা দেখি ও আগ্রহের সহিত পড়ি।

এক বছর বন্দী থাকার পর পত্র লিখতে বসলাম। এ একটা খেয়াল। তাছাড়া আর কিই বা বলি। এতো কাছে থেকেও এতো দূরে—কিন্তু তাতে চার দিকের রুক্ষ দেয়ালগুলি বন্দীর চিন্তা মানস রুদ্ধ করতে পারে না। মনে ভেসে আসে ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি। কবির কথা মর্মে উপলব্ধি করছি—'কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।' কেবল কি শুনি, অন্তরের টেলিভিসন দিয়ে দেখিও। জয়াদির স্নেহ সঞ্চিত আদরে সোনার মেয়েদের পড়', জয়াদির সযত্নে রক্ষিত সুপের সুস্বাদু খাবার খাওয়া, শ্যামসুন্দরের সাথে বসে জয়াদির তৈরী করা রসনা ,তৃপ্তি দায়ক ভোজ সব মনে পড়ে। কবি শ্যামসুন্দরের কবিতা শোনা। আধ ফোটা ফুলের মত সুন্দর খোকাটার আধ আধ বুলি, আর তার বাবার কথাও মনে পড়ে—যিনি বলতেন, আসবেন মুরগী ডিম দিচ্ছে, আবার আসবেন। সকলের সকল ছোট বড় কথাই মনে জাগে দুঃখের বিষয় —

'বাধা হয়ে আছে মোর
বেড়াগুলি জীবন যাত্রায়'

যাদের কথা ভাবি, যাদের স্মৃতি চিত্তমানস অধিকার করে আছে তাদের কাছে পাই না।

সকলেই মনে জাগে চোখের সম্মুখে ভাসে। যাদের ভাল করে জানি। আর যাদের কম জানি, সকলেই আজ অন্তর মাঝে এসে ভীড় করছে।

কাকেও ভুলে থাকা যায় না।—

'ভুলে থাকা নয় যে তো ভোলা,
বিস্মৃতির মর্মে বসি—

'নয়ন সম্মুখে' যাদের পাই না, নয়নের মাঝখানে দেখি তারা ঠাঁই করে নিয়েছে আমাদের মত জীবন ধারার মাঝে এতো বাস্তব সত্য আর ভাবি সকলেই যেন এগিয়ে চলেছে, আমি বসে আছি রুদ্ধদ্বার কক্ষে।

জয়াদির স্বাস্থ্য কেমন। এ শীতে তার হয়ত কষ্ট হয় কাজ কর্ম করতে। ঘরের লোক বাড়িয়ে জয়াদির কষ্টের কি লাঘব করার সময় আসে নাই।

প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন সহ
সতীশদা
Satish Pakrashi
Medical College Hospital

অসুখ বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এখন হাসপাতালেই আছি চিঠির ঠিকানা চিঠির প্রথমে ওপরে যা লিখা আছে তাই।

সতীশদা

Puri, 4.12.70

শ্যামসুন্দর প্রিয় কমরেড,

পত্র পেয়ে খুশী হলেম। তীব্র শীতে আছি। হোটেলে খাই। শ্বাসকষ্ট লেগেই আছে। বাঁচলে পরে যেয়ে বই প্রকাশের তদ্বির করা যাবে এবং বেঁচে থেকে কাজ কর্মের ক্ষমতা থাকলেই কিছু করা যাবে নয়তো এখানেই শেষ। স্বাস্থ্য ভালর দিকে যাচ্ছে না। পরিচিত কর্মী বা বন্ধুরা মরে যাচ্ছেন। জীবন চাটার্জীর মৃত্যু সংবাদ কাগজে দেখলাম—ঘাটের মৃত্যু সংবাদ দেখলাম গতকাল। যে তাজা প্রাণগুলি গুলিতে, বোমায় বা ছোরায় শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি তাদের কথা বলছি না। কলকাতায় দৈনন্দিন রক্তারক্তি ও হতাহতের ঘটনা কাগজে পড়ছি তা ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক। মহান বিপ্লবকে ওরা কোন সংকীর্ণ খাতে নিয়ে যাচ্ছে।

এতো বিপ্লবের নামে ব্যথিত হতাশ মনের ক্রোধান্ধ বিকার। —যৌবন জীবনের লক্ষ্যহীন যুক্তিহীন উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়না। এ স্থায়ী হতে পারে না। নিজের ভারেই নিজেরা ভেঙে পড়বে কিন্তু তার আগে অনর্থ করে যাবে কত?—একেই বলে শিব গড়তে যেয়ে বানর গড়ে তোলা। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের গতিপথে কতবার কত ভুলই না হয়েছে। সুষ্ঠু বিপ্লব পথের স্বাভাবিক গতি নষ্ট করে দিয়েছে ভ্রান্ত সংগ্রামে।

সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের ও নৌবিদ্রোহের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্প্রসারণের পথে গান্ধী এক ভ্রান্ত নীতি ও ভ্রান্তকর্মপথে দেশের মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। গান্ধীর আন্দোলন বিপ্লবের সহায় নয়, বরং অন্তরায় পরে নেতাজী সুভাসচন্দ্র উগ্র দেশপ্রেমে মত্ত হয়ে ফ্যাসীবাদী ক্যাম্পে যোগ দিলেন—গণতন্ত্রবাদী প্রগতির সংগ্রাম পথের বিরোধিতা করলেন। এই দুই বড় নেতাও শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে তুলেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশটাকে দ্বিধা বিভক্ত করে গদী দখল করলেন। পরাধীন ছিল যারা সর্বহারা, বুর্জোয়া, তারা গদী পেয়ে সর্বশক্তিমান হওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজসে একচেটিয়া পুঁজিপতি হলেন। ভারতে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। এত সব ভুলের মাশুল দিচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ। এবার আবার নকশাল পন্থীরা সংগঠিত সংগ্রাম পথে গণশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Forces of Progress unity and organised mass action must thwart these forces of adventurism reaction and frustration.

তবে এখন তো ওরা ধ্বংসকাণ্ড চালাচ্ছে এই phase থাকবে না—থাকতে পারে না। সুস্থ বিপ্লবের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। যাক। সাবধানে চলা ফিরা করবেন। জন্মাদি কেমন আছে। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল। সতীশদা

সতীশ পাকড়াশী সম্পর্কে

১৯০৫-৬ সালের কথা। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল হয়ে উঠেছে সে আন্দোলন। ঢাকা জেলার একটি গ্রাম্য হাই স্কুলের ছাত্রদের প্রাণেও তার ঢেউ-এর দোলা এসে লেগেছে। ১২-১৩ বছরের ছোট্ট একটি ছেলেও তাতে মেতে উঠেছে। সে বড়দের ফাইফরমাস খাটে, ভলান্টিয়ারি ক'রে বেড়ায়। এর বেশী কী-ই বা সে করতে পারে?

প্রকাশ্য আন্দোলনের দ্বারা বৃটিশ সরকারকে নোয়াতে না পারার ফলে যুবকদের প্রাণে যে হতাশা এলো তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে কলকাতায় গঠিত হলো গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান—'অনুশীলন সমিতি'। এবারে শুধু বঙ্গভঙ্গের রদ তারা চায় না, ভারতের স্বাধীনতাও কাম্য। তেমন কোন প্রোগ্রামও তাদের নেই, জনগণের সঙ্গেও নেই কোন যোগাযোগ, তবুও ভদ্রঘরের ছেলেরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে—তারা মারবে ও মরবে।

ঢাকাতেও অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হলো। আমাদের সেই ১২-১৩ বছরের ছেলেটিও যোগ দিল এই সমিতিতে। তারপরে, তাঁর বয়স কিছু বাড়ল, কাজের ভিতর দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন অনুশীলন সমিতির নেতাদের একজন। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ তিনি—আমাদের শ্রদ্ধেয় কমরেড সতীশ পাকড়াশী—সুপরিচিত। ১৯০৫-৬ সালে তিনি কাজে নেমেছিলেন, আর আজ হচ্ছে ১৯৪৭ সাল। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভিতরে একদিনের জন্যেও তিনি নিজের বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্র থেকে স'রে দাঁড়াননি। রিভলভার নিয়ে ধরা প'ড়ে তিনি জেল খেটেছেন সেই যুগে, সে-যুগে কয়েদীদের গলায় লোহার হাঁসুলি, আর পায়ে লোহার মল পরতে হ'ত।

বছরের পর বছর তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে কাজ করতে হয়েছে। ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে নজরবন্দী হয়েও তাঁকে কাটাতে হয়েছে কয়েক বছর। ছাড়া পাওয়ার পরে আবার নজরবন্দী হয়েছেন, মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় সাজা নিয়ে গিয়েছেন আন্দামানে, আবারও হয়েছেন নজরবন্দী। এই-ভাবে তাঁর শরীরের উপর দিয়ে রাজ-লাঞ্ছনার ঝড়ের পর ঝড় বয়ে গেছে কিন্তু কোন কিছুই দমাতে পারেনি তাঁকে, অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি

তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা জায়গায়। তাঁকে দেখলে কিংবা তাঁর সাধারণ কথা-বার্তা থেকে নূতন পরিচিতেরা বুঝতেই পারেন না যে, চল্লিশ বছরেরও বেশী কাল ধরে তিনি বৈপ্লবিক কর্ম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রেখেছেন। সাদাসিদে অল্পভাষী লোক তিনি।

"অগ্নিদিনের কথা" কমরেড সতীশ পাকড়াশীর "স্মৃতিকথা"। অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি তাঁর সন্ত্রাসবাদী জীবনের কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্মৃতি মানুষকে অনেক সময়ে প্রতারণা ক'রে থাকে। সেই দিক থেকে কোন কোন ঘটনার বিবৃতিতে সামান্য কিছু ভুল থাকা অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এই পুস্তকখানা কেবলমাত্র কমরেড পাকড়াশীর স্মৃতি কথাই নয়, এ-খানা আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি যুগের একটা দিকের ইতিহাসও বটে। সন্ত্রাসবাদী বাংলার অনেক খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্মীদের মতো কমরেড সতীশ পাকড়াশীও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছেন। বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌঁছেও তিনি 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মঠ সভ্য। দীর্ঘ জীবনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি বুঝেছেন যে, জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্লব হয় না এবং 'কমিউনিস্ট পার্টি' জনগণের একমাত্র বিপ্লবী পার্টি।

অনেক ঝড ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়েও কি ক'রে কাজে লেগে থাকতে হয় তা আমরা কমরেড পাকডাশীর জীবন থেকে শিখতে পারি। এই জন্যেও রাজনৈতিক কর্মীদের এই পুস্তকখানা পড়া উচিত।

কলিকাতা
৩রা এপ্রিল, ১৯৪৭ } মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

["অগ্নিদিনের কথা" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (এপ্রিল ১৯৪৭) এ, প্রকাশিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর রচিত—লেখক ও গ্রন্থ পরিচিত]

শ্যামসুন্দর

সতীশবাবুর শরীরের অবস্থা এখন কেমন তা জানিনে। তাঁর পুস্তকে কিছু কিছু ভুল আছে। সেগুলির সংশোধন তাঁরই করা উচিত। যদি তিনি না পারেন তবে তুমিই তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা মতো শুদ্ধ করে দেবে।

৫২ পৃষ্ঠায় আছে :

"রংপুরেও একটি বড ডাকাতি হয়। ব্যাপারটি নাটোর মহকুমার এক গ্রামে···।" নাটোর কিন্তু রাজশাহীর মহকুমা রংপুরের নয়।

৫৬ পৃষ্ঠায় বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে খুন করার কথা লেখা হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় তখন পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নয়।

৯৩ পৃষ্ঠা···

১২ টি পিস্তল রাখার অপরাধে দু কড়িবালা দেবীর (চক্রবর্তী) দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। তাঁর মোকদ্দমা সিউড়ীতে হয়েছিল। কিন্তু পিস্তল ধরা পড়েছিল তাঁর নিজের বাড়িতে নলহাটি থানার অধীন ঝাউপাড়া গ্রামে। দু'কড়িবালাই বাংলা দেশের প্রথম মহিলা যিনি রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

রডার পিস্তলের সংখ্যা ৫০ ছিল না, আরো অনেক বেশী ছিল। দুকড়িবালার নিকটেই ১২ টি ছিল। সঠিক বিবরণ দেওয়া উচিত।

১০৩ পৃষ্ঠায়

কাকোরি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় লখনউতে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। তিনি পাবনা জিলার লাহিড়ী মোহন পুরের লোক। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায়ও তাঁর সাজা হয়েছিল। কমরেড সতীশ পাকড়াশী তাঁকে সুশীল লাহিড়ী লিখেছেন।

১০২ পৃষ্ঠায়

মুসলমানদের সম্বন্ধে অনুশীলন সমিতির অনুষ্ঠান পত্র আমি উদ্ধৃত করেছি। সতীশ বাবুকে তুমি সেটা পড়ে শোনাবে। তিনি সে রকম যদি লিখতে না চাইলে না লেখাই ভালো।

গোপেন চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির পরিচয় পত্র নিয়ে যান নি। তাঁর নিকটে নলিনী গুপ্তের পরিচয় পত্র ছিল। অবনী মুখার্জীর পরিচয় পত্র নিয়ে গেলে গোপেনকে এম. এন. রায় গ্রহণ করতেন না। অবনী ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি হতে, কমিউনিস্ট ইনটার ন্যাশনালের কাজ হতে ও রুশ হতে বিতাড়িত ছিল। নলিনীকে রমেশ চৌধুরী ঢাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বোমা শেখাবার জন্যে। আর অবনীকে প্রতুল গাঙ্গুলী নিয়ে গিয়েছিলেন। নলিনীকে তিনি পসন্দ করতেন না। বাধ্য হয়ে তাকে ঢাকা ছাড়তে হয়। চারুবিকাশ দত্ত নলিনীকে খুলনা নিয়ে যায়। তারপরে ২০ শে ডিসেম্বর, (১৯২৩) তারিখে নলিনী কলকাতায় ধরা পড়ে। সতীশবাবু বোধ হয় জানেন না যে ১৯১৪ সালে নলিনী অমৃতলাল হাজরার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিল। তারপরেই সে লণ্ডনে চলে যায়।

গোপেন যখন মস্কো পৌঁছালেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির একখানি পত্র সেখানে পৌঁছয়। তাতে লেখা ছিল যে গোপেন তাঁদের লোক নয় এবং সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক। আমার মনে হয় অবনী পত্রখানি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ইউরোপ হতে পোস্ট করেছিল। তারজন্য তিনি প্রাচ্য জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন নি। এটা সত্য কথা। গোপেন নিজেই আমার নিকটে একথা ১৯২৬ সালে স্বীকার করেছেন। (সতীশবাবু একথাগুলি সঠিকভাবে লিখতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। কথাগুলি যদি তিনি পুস্তক হতে বাদ দেন তবেই ভালো হবে। আমি এ জন্যে বলছি যে বই ছাপা হলে আমাদের কাউন্টার হতে বিক্রয়ের কথা উঠবে।)

আমার কথা বললাম। (সতীশ বাবু যা ভালো মনে করেন তাই তিনি করবেন।) এ কথা সত্য যে অবনী অনুশীলন সমিতিকে হাইকোর্ট দেখিয়ে গেছে। (সতীশবাবু ওর সঙ্গে গেলে বিপদে পড়তেন।) আর এক কথা। অবনী সওদাগরী জাহাজে ফিরে যায়নি। সে কলম্বো হতে টিকিট কিনে প্যাসেঞ্জার হয়ে গিয়েছিল। ডক্টর শাহীর নামে তাঁর পাসপোর্ট ছিল।

আন্দামান থেকে ফিরে এসে সতীশ পাকড়াশী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সংগে যোগাযোগ করেন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করতে সুরু করেন। সতীশ পাকড়াশীর আত্মজীবনীমূলক কাহিনী 'অগ্নিযুগের কথা'-বইটির প্রথম সংস্করণ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রকাশিত করে এবং বইটির ভূমিকা লেখেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হবার দীর্ঘকাল পরে বইটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হলে তিনি বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখান। এই সময়ে

উভয়েই অসুস্থ থাকার কারণে পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। 'অগ্নিযুগের কথা' পরিবর্ধিত সংস্করণটির প্রকাশ ও ব্যবস্থা শ্যামসুন্দর দে করেন। তিনি উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ রাখতেন। শ্যামসুন্দর দে এই চিঠিটি পাবার পরে সতীশ পাকড়াশীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সতীশ পাকড়াশী নিজেই সংশোধন করেন। চিঠিটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় এই সংকলনে সংকলিত করলাম।

শান্তিময় গুহ
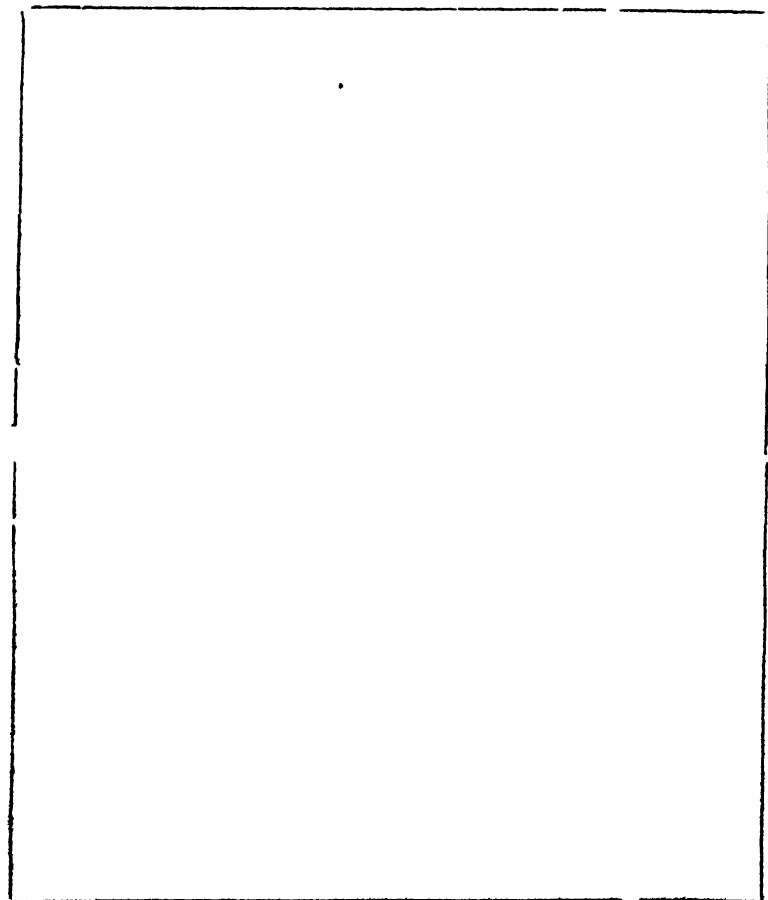
সতীশদা

গণেশ ঘোষ

…সতীশদার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯২৫ সালের মে-জুন মাসে মেদিনীপুর জেলে। মেদিনীপুর জেলে তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দলের অনেক সর্বোচ্চ নেতা রাজবন্দী হিসাবে আটক ছিলেন। আমাকে যখন ঐ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন বন্দীদেব মধ্যে আমিই হয়ে পডলাম সর্বকনিষ্ঠ এবং স্বাভাবিক ভাবেই আমি সকলের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রে পরিণত হলাম। আমি যখন মেদিনীপুব জেলেব বাজবন্দীদের আঙিনার মধ্যে গিয়ে পৌছলাম তখন সব দাদারাই এগিয়ে এসে আমাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করলেন এবং সকলেই আমাকে আশ্বাস দিলেন, আমাব যদি কিছু প্রয়োজন হয়, বা কোনপ্রকার অসুবিধা হয় তাহলে তাঁরা অবশ্যই আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের বহু নেতার সাথেই তখন পর্যন্ত আমার পরিচয় ছিলো না ; যাঁদের নামই শুধু আমি জানতাম এবং যাঁদের বীরত্ব ও বুদ্ধিমতাব নানা কাহিনী শুনে শুনে যাঁদের সম্পর্কে আমার মনে অপরিসীম শ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হয়েছিলো, তাঁদের অনেককে সামনাসামনি পেয়ে এবং তাঁদেব কাছ থেকে ঐরূপ অভাবিত আশ্বাস লাভ করে আমি যথার্থই অভিভূত হয়ে পডেছিলাম।

তার পরের দুতিন দিনের প্রায় সারা সময়ই আমার কেটেছে বড বড দাদাদের কাছে বসে থেকে এবং তাদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। ঐ সময়ে ঐ অবস্থায় আমার মনে হয়েছিল এরূপ সুযোগ পাওয়া নিশ্চয়ই একটি অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা।

তারপর একদিন বিকালবেলা। তখন প্রায় ঘরের সকলেই রাজবন্দীদের আঙিনার বাইরে চলে গেছেন কেউ কেউ বা টেনিশ খেলতে এবং অপর বেশির ভাগই পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ব্যায়াম করতে। ঘরে তখন কেবলমাত্র একজন দাদা ছিলেন এবং তিনিও বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমিও কাপড়-চোপড় পড়ছিলাম বাইরে যাবার জন্য। হঠাৎ তিনি আমার নাম ধরে কাছে ডাকলেন। দেখলাম অবয়বে তিনি অতিশয় ক্ষীণ, শীর্ণ দেহ, নাতি দীর্ঘ। দাড়ি কামানো পরিষ্কার মুখে অস্বাভাবিক বড়ো একজোড়া গোঁফ। এর আগের দু'তিন দিনে আমি দেখেছিলেম তিনি খুব কম কথা বলেন, সারাদিনে এবং সন্ধ্যার পরও কম লোকের কাছে যান এবং দিন রাতে

যতক্ষণ জেগে থাকেন সব সময়ই কিছু না কিছু পড়েন ; হয় কোন খবরের কাগজ, নয় কোন বই কিংবা কোন সাময়িক পত্রিকা। তিনি প্রায় প্রতিদিনই বিকালে টেনিশ খেলতেন এবং খেলতেন বেশ ভালই।

তাঁর সম্পর্কে দু'তিন দিনের মধ্যে দুটি জিনিস আমার চোখে পড়েছিল এবং সেই দুটিই ছিলো তাঁর সেই সময়কার একান্ত বিশেষত্ব। তিনি প্রায় সারাক্ষণই একটি না একটি হাত দিয়ে মুখে ঐ অস্বাভাবিক বড় গোঁফ মুচড়ে মুচড়ে তা দিতে ভালোবাসতেন। এবং ভালোবাসতেন সারাদিনের যে কোন সময়ে যখনই তিনি কোন কারণে ঘর থেকে বাইরে যেতেন তখনই বেশ উচ্চৈস্বরে একটি বিশেষ গানের দুটি লাইন নিজস্ব স্বর দিয়ে গাইতেন,—"সে কোন বনের হরিণ ছিলো আমার মনে" বেশির ভাগ সময়ে কেবল এইটুকুই, কিন্তু কোন কোন সময়ে এইটুকুর সাথে আর একটি লাইনও সংযোজিত হতো,—"তারে কে বাঁধল অকারণে" তিনি কিন্তু আদৌ গান জানতেন না এবং তাঁর মোটেই স্বর-জ্ঞান ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। তিনি নিজের মত স্বর দিয়ে, নিজের ভঙ্গীতে বেশ উচ্চৈস্বরেই ঐ গানটি গাইতে ভালোবাসতেন। অন্যের কাছে তা অদ্ভুত এবং অবশ্যম্ভাবিরূপে তা অন্যের হাসির উদ্রেক করতো। কোন কোন দাদা তাঁর এই দুটি অভ্যাস বা মুদ্রাদোষ নিয়ে প্রায় সততই কৌতুক করতে এবং যখনই তিনি ঘরের বাইরে পা দিয়েই আরম্ভ করতেন, "সে. কোন...তখনই তাঁদেরও কেউ না কেউ ঠিক তেমনি উচ্চৈস্বরে এবং বিকৃত বেসুরোভাবে গেয়ে উঠতেন, "সে কোন বনের হরিণ..."। এইসব পরিহাস এবং কৌতকান্বিত বিদ্রূপ কিন্তু তাঁকে কখনও কিছুমাত্রও অপ্রস্তুত বা হতাশ করতে পারত না। তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং বেপরোয়াভাবে নিজস্ব ধরনে বেসুরো গলায় গেয়েই চলতেন 'সে কোন বনের"......।

তাঁর গোঁফে চাড়া দেওয়া নিয়েও ঐ সব দাদারাই প্রায় সময়ে কৌতুক করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, এবার একজনকে স্থির করে একটা গুরুতর দায়ীত্ব নিতে হবে, ঐ মুখের দুদিকের ঐ বিরাট বিরাট গোঁফের সংখ্যা প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় সঠিকভাবে গণনা করে রাখবার জন্য ; কারণ হঠাৎ কোন সময়ে কোন কারণে যদি মুখের একদিকের গুম্ফগুচ্ছে একগাছি গোঁফ বেশী হয়ে যায় তাহলেই তিনি সুনিশ্চিত ভাবেই সেই দিকেই কাৎ হয়ে পড়বেন।

আমি মেদিনীপুর জেলে যাওয়ার দুতিন দিনে তাঁর সম্বন্ধে এসব কথা

শুনেছিলাম এবং তাঁকে দেখেছিলাম। কিন্তু তিনি ছিলেন বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের একজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা; তাই ঐসব পরিহাসের কথা শুনেও তাঁর সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা জাগে নি, বরং অপরিসীম শ্রদ্ধাই ছিল। কিন্তু ঐ দিন বিকালের আগে পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার কথা বলার কোন সুযোগই হয় নি। এবং আমিও মনে মনে এতখানি সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি যে, নিজেই তাঁর সাথে গিয়ে পরিচয় করি এবং কথা বলি। তাই তিনি যখন সেদিন অপরাহ্নে প্রায় নির্জন গৃহের মধ্যে আমাকে কাছে ডাকলেন, তখন আমি খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেম এবং খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম। আমার সুনিশ্চিত ধারণা ছিল ঐ শীর্ণ দেহে যখন অত বড় গোঁফ রয়েছে তখন উনি নিশ্চয়ই খুব বদরাগী এবং আমার চলাফেরা বলা বা কথাবার্তায় হয়ত কোন অশোভনতা প্রকাশ পেয়েছে যার জন্য উনি বোধহয় আমাকে বকবেন এবং ধমক দেবেন। কিন্তু তাঁর ঐ আহ্বান অমান্য করার সাহস আমার মধ্যে ছিল না; তাই আমি ধীর পদে ভয়ে ভয়ে সঙ্কোচে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু খুব অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি হাসি হাসি মুখে অতি কোমল এবং পরিপূর্ণ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেন জেলে বন্দী হয়েছি, আমার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, আমি কতদূর পড়াশুনা করেছি এবং কি কি পড়েছি ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। শেষকালে তিনি বললেন আমি যদি তাঁর কাছে কোন বিষয়ে পড়াশুনা করতে চাই, তিনি খুব আনন্দের সাথে সাহায্য করবেন।

তাঁর স্নেহপূর্ণ কথাবার্তায় এবং শেষ কথায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, দৃশ্যত ঐ কঠোর ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার প্রতি কেন এতো স্নেহপূর্ণ ও সদয় হয়ে উঠলেন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি গিয়ে গোপনে আমার বিপ্লবী দাদার কাছ থেকে জেনে নিলাম তাঁর নাম সতীশ পাকড়াশী এবং তিনি অনুশীলন দলের একজন অতি পুরানো এবং উঁচু পর্যায়ের নেতা তাঁর সম্পর্কে আরও জানতে পারলাম তিনি দেখতে ঐরূপ কঠোর হলেও আদৌ বদরাগী বা কঠোর প্রকৃতির নয়, তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং কোমল প্রকৃতির মানুষ। আমি সতীশদার কাছে পড়াশুনা করা সম্পর্কে দাদার অনুমতি নিলাম।

পরদিনই সতীশদার কাছে আমার পড়াশুনা আরম্ভ হল। সতীশদা কয়েকটি

প্রশ্ন করে আমার জ্ঞানের শোচনীয় স্বল্পতা ও অভাবের কথা জেনে নিলেন এবং আমাকে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়াতে আরম্ভ করলেন।

সেই থেকে যে ১৮/১৯ মাস আমি মেদিনীপুর জেলে সতীশদার সান্নিধ্যে ছিলাম, সতীশদা আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অতিশয় যত্ন ও আগ্রহ নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস, বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভারতের অতীত ইতিহাস এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস পড়িয়েছেন। আমি সতীশদার কাছেই শুনেছি আমার প্রতি সতীশদার ঐ গভীর স্নেহ প্রকাশের জন্য তাঁকে কোন কোন সময়ে কিছু কিছু পরিমানে নিগৃহীত হতে হয়েছে। কিন্তু সতীশদার বিপ্লবী কতর্ব্যজ্ঞান তাঁর নিজস্ব সুবিধা অসুবিধার বহু উর্দ্ধে ছিল।

সতীশদার কাছে আমি অপরিসীম ঋণী। সেই সময়ে সতীদাকে দেখে এবং তাঁর সাথে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়ে সতীশদাকে একজন আদর্শ বিপ্লবী বলেই আমার মনে সুস্পষ্ট ধারণা ও বিশ্বাস হয়েছিলো। আমি দেখেছি সতীশদা শুধু স্নেহপরায়নই ছিলেন না, প্রয়োজনে ও উপযুক্ত সময়ে তিনি বজ্রের মতো কঠোরও হতে পারতেন এবং তাঁর যে চোখে সতত মায়া ও স্নেহ বর্ষিত হত, সেই চোখই প্রচণ্ড অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে পারত। মেদিনীপুর জেলেই কয়েকবার দেখছি জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে জেলের ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেটের অনায্য খামখেয়ালীর প্রতিবাদে ঐ রুগ্ন শীর্ণ দেহ নিয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ সতীশদা রাগে কাঁপতে কাঁপতে এবং বিস্ফারিত লাল চোখে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে এসে সুপারিণ্টেণ্ডের একেবারে নাকের ডগায় ঘন ঘন তর্জনী আস্ফালন করে তীব্র আপত্তি জানাতে। দু একবার ঐ অবস্থায় পরিস্থিতি এত সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল যে, সতীশদার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয়েছিলো তখনই বুঝি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আদেশ দেয় সতীশদাকে নিয়ে গিয়ে কুঠুরীতে বন্ধ করে রাখতে। এবং সেই অবস্থায় পরিস্থিতি যে অতি মাত্রায় গুরুতর হয়ে পড়বে একথা ভেবে আমরা সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। কিন্তু সৌভাগ্যবশত কখনও ঐ অবস্থা হয়নি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই প্রতিবার পশ্চাৎ অপসারণ করেছে। এবং শুধু মেদিনীপুর জেলেই নয়, আন্দামানেও সতীশদার দীর্ঘকালের সাহচর্যে দেখেছি জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে সতীশদাকে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে। সেই অবস্থায় সতীশদাকে আর যেন চেনাই যেত না। আগে আমার শুধু

বইতেই পড়া ছিল কিন্তু মেদিনীপুর জেলে সতীশদাকে দেখে আমি বুঝেছিলাম যে, "মৃদুনি কুসুমাদপি" অথচ "বজ্রাদপি কঠোরাণি" বলে যে একটি বিখ্যাত এবং সুন্দব সংস্কৃত শ্লোক আছে, তা শুধু সাহিত্যিকদের কল্পনাব সৃষ্টি নয় ; সুদুব অতীতেও আমাদেব দেশে নিশ্চয়ই সতীশদার মত কেউ ছিলেন, যাঁকে দেখে সংস্কৃতের সাহিত্য স্রষ্টাবা ঐ সুন্দব কথাটি সৃষ্টি করেছিলেন।

তরুণ বয়সে সতীশদার জীবনেব আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল মাতৃভূমিব শৃঙ্খল মোচন। এবং এই লক্ষ্য অর্জনেব জন্যই তিনি নিবলস সংগ্রাম কবেছেন এবং অপবিসীম দুঃখ ভোগ কবেছেন। কিন্তু নিবন্তব সংগ্রামেব অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন, দেশের বাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ কখনই সর্বাঙ্গীন মুক্তি অর্জনের শেষ মাত্রা হতে পাবে না। দীর্ঘ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেব বাস্তব অভিজ্ঞতা, কঠোর অধ্যয়ন এবং গুরুতব চিন্তাব ফলে সতীশদা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, জাতীয় স্বাধীনতা কেবল গণমুক্তিব অর্থাৎ জাতিব সর্বাঙ্গীণ এবং পবিপূর্ণ মুক্তিব একটি ধাপ মাত্র। সতীশদাব স্বাভাবিক এবং চিব-বিপ্লবী মন গণমুক্তির আদর্শ মেনে নিতে এবং মার্কসবাদ গ্রহণ কবতে কিছুমাত্রও দ্বিধা কবে নি।

সতীশদার সমস্ত জীবনই ছিল বিপ্লবেব জন্য নিবেদিত এবং বিপ্লবেব আদর্শে গঠিত। প্রায় ৭০ বছব আগে সেই কোন সুদূব ১৯০৬ সালে মাতৃভূমিব শৃঙ্খল মুক্তির স্বপ্ন দেখে এবং শপথ নিয়ে সতীশদা ঘর ছেড়ে আবাম, আয়াস পরিত্যাগ কবে বিপ্লবের অন্বেষণে পথে বেবিয়ে পড়ে যে চলা আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর সেই পথ পরিক্রমা অনেক বন্ধুব মতো ১৯৪৭ সালে শেষ হয়ে যায় নি ; সেই অশান্ত বিপ্লবীর অক্লান্ত চরণেব পদক্ষেপ কেবলমাত্র স্থির এবং স্তব্ধ হয়ে গেল ৬৭ বছর পবে সেদিন, ১৯৭৩ সালেব ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে। গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে এবং পরিপূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে সতীশদা যখন শয্যায় একেবারে বন্দী হয়ে পড়েছিলেন, তখনও এবং এমনকি একেবারে শেষবারে সংজ্ঞা হারাবাব পূর্ব মুহূর্তেও সতীশদা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই সে দিনও কিউবা এবং চিলি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে সতীশদা ঐ দুই দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন।

মৃত্যুর সুনিশ্চিত প্রভাবে পড়েও গণমুক্তি সম্পর্কে এই অস্বাভাবিক ঔৎসুক্য অন্তরের যথার্থ এবং অকৃত্রিম বিপ্লবী প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সতীশদা ছিলেন চির-বিদ্রোহী এবং তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়েই তিনি তাঁর পরিচয় অনপনেয় ভাবে রেখে গিয়েছেন।

বাংলাদেশ

(সাপ্তাহিক) ১১ই জানুয়ারী ১৯৭৪

কমরেড সতীশ পাকড়াশী স্মরণে

সুধাংশু দাশগুপ্ত

আর একটি বিপ্লবী জীবনের অবসান ঘটলো। কমরেড সতীশ পাকড়াশী— আমাদের প্রিয় সতীশদা এস এস কে এম হাসপাতালের উডবার্ণ ওয়ার্ডে ৩০শে ডিসেম্বর সকাল দুটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ব্রিটিশ আমলে ছাত্রাবস্থায়ই তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অনুশীলন সমিতির সাধারণ কর্মী হিসাবেই তাঁর রাজনীতিতে হাতে খড়ি। নিজের কর্মধারা দিয়ে তিনি সেই অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর সে সময়কার জীবন কেটেছে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করার মধ্য দিয়ে আর বন্দীদশার মধ্য দিয়ে। তিনি ছিলেন তারুণ্যের উপাসক। তাঁর নাড়ির টানটা ছিলো অনুশীলন সমিতির তরুণ কর্মীদের সঙ্গে। সে সময়ে পথ চলার ক্লান্তিতে তিনি স্থবির হয়ে যান নি। তাঁর সমকালীন বিপ্লববাদী নেতারা যখন ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং নেতাদের সেই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে, তারুণ্যের জয়গান গেয়ে তরুণ বিপ্লববাদীরা 'রিভোল্ট গ্রুপের' প্রতিষ্ঠা করল, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মধারা নিয়ে মেতে উঠলো—তখন সেই তরুণ বিপ্লববাদীদের সাথেই সতীশদা হাত মেলালেন। তাই তো তাঁকে আমরা দেখলাম ১৯৩০ সালের মেছুয়া-বাজার বোমার মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে। সেই মামলায় তিনি সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই দণ্ডাদেশের প্রথম তিনটি বছর তার কেটেছে আলীপুর জেলে, রাজসাহী জেলে এবং বিহারের হাজারীবাগ জেলে এবং পরবর্তী চারটি বছর কেটেছে আন্দামান সেলুলার জেলে। এই সুদীর্ঘ সাত বছরের জেল জীবন তাঁর জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। গভীর আত্মানুসন্ধান ও

অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে, এই কারাজীবনে তিনি নতুন পথের, মার্কসবাদ—লেনিনবাদের পথের সন্ধান পেলেন এবং সেই পথ ধরেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ভারতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

তাই এ কথা বলা আদৌ অসঙ্গত নয় যে, মেছুয়াবাজার বোমার মামলার মধ্য দিয়ে সতীশদার বিপ্লবী জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সে অধ্যায় তাঁর জীবনের বিরাট-আত্মত্যাগ, অপূর্ব বীরত্ব, অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাঁর রচিত 'অগ্নিযুগের কথা'র—পাতায় পাতায়ই সে কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে কাহিনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে তার তৎকালীন জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে, "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" আর "মৃত্যুর গর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতো" কথা কয়টির মধ্য দিয়ে। সে সময়ে সতীশদাকে আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অনুশীলন দলের 'বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতির' অন্যতম সুদক্ষ সংগঠক হিসাবে। তাঁকে আমরা দেখতে পাই গৌহাটি পাহাড়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে। সে সময়ে তাঁর জীবনের দিনগুলি কেটেছে কখনো আত্মগোপন অবস্থায়, কখনো কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে চলা সব সময় সম্ভব হয়নি বলেই তাঁকে জীবনের সে সময়কার এক বিরাট অংশ কাটাতে হয়েছে বন্দীদশায়, বিনাবিচারে আটক অবস্থায়।

তাঁর বিপ্লবী জীবনের এই অধ্যায়ের ছেদ টেনে দিল মেছুয়াবাজার বোমার মামলা। এই মামলায় সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর জেল-জীবনে যে গভীর আত্মানুসন্ধান তিনি শুরু করলেন তার মধ্য দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর অতীত জীবনের কর্মধারার প্রকৃত রূপটা। তাঁর নিজের কথায়:

"আমার প্রথম জীবনে দেশের দুঃখ ও দাসত্ব মোচনের জন্য বোমা-পিস্তল নিয়ে সংগ্রামের পথে বের হয়েছিলাম। সেদিন "মৃত্যুর গর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতো।" "দেশের দুঃখ-মোচন" কথাটার কোন সংজ্ঞা ছিল না। মৃত্যু বরণ করারও কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। একজন বীরপণার রোমাঞ্চ দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, আর একজন হয়তো গভীর প্রেরণা ও মানবতার অনুরাগে মরণের কোলে

ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মত্ত। একজন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানই সকল দুঃখ সমস্যার অবসান হবে বলে মনে করতেন; অন্যজন মনে করতেন দেশের সকল লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ভেতর দুঃখ মোচন নিহিত। সুস্পষ্ট কোন আদর্শ না থাকায় বিভিন্ন বিপ্লবী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আদর্শের ছাঁচ তৈরী করে নিজেকে চালিত করতেন ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে অবশ্য লড়াই করার প্রবল বাসনা সকলেরই ছিলো। কিন্তু সে লড়াই কারা করবে? কাদের শক্তি সংহত করে, আমরা বিজয়ী হবো, কারা শেষ অবধি সংগ্রামের পথে অবিচলিত থাকবে?—এ সকল প্রশ্ন আমরা মধ্যবিত্ত বিপ্লবী ভদ্রলোকেরা ভাবিনি। কাজের আনন্দেই কাজ করে চলেছিলাম। জেলের দোতলা তেতলায় বসে অদূরে ঐ সাগর তরঙ্গের সাথে আমাদের মনের বিপ্লব তরঙ্গেও দোলা খেত। স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কাদের বা কোন শ্রেণীর হাতে যাবে, তা-ও ভাবনি। ভেবেছিলাম, শুধু স্বাধীনতা লাভ করলে সব দুঃখের অবসান হয়ে যাবে। শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে সমাজের উপর তলার সাথে নিচের তলার বিরোধ বাধবেই—তা না বুঝবার জন্যই তো শ্রেণী-সমন্বয়ের বুর্জোয়া নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলাম।"

[১৯৬৭ সালের দেশহিতৈষীর শারদ সংখ্যায় সতীশদার লেখা 'বিপ্লবের সন্ধানে বিপ্লবী বন্দিরা' শীর্ষক প্রবন্ধ।]

আন্দামান সেলুলার জেলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে এবং নিজের বিপ্লবী অতীতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে "শ্রেণী সমন্বয়ের বুর্জোয়া নীতিতে বিশ্বাস" ভাঙলো এবং তিনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদের শ্রেণী সংগ্রামের ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আদর্শকে নিজের বিপ্লবী জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন, আন্দামানে কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে যোগ দিলেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের মোড় ঘুরে গেলো।

দীর্ঘ কারাবাসের পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। ঢাকায় পার্টির কাজ সুরু করলেন। পরবর্তীকালে পার্টির প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশে তিনি কলকাতায় এলেন প্রাদেশিক দপ্তরে কাজ করার জন্য। পার্টি-তহবিলের দায়িত্ব অর্পিত হোল তাঁর উপর। সেই দায়িত্ব তিনি বলশেভিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন।

দেশ স্বাধীন হোল। কংগ্রেসী শাসকেরা পার্টিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করলো এবং বহু কমরেডকে বিনাবিচারে আটক করলো। এই সময়

সতীশদাকে গ্রেপ্তার করে বন্দী শিবিরে আটক রাখা হয়। দু'বছর পরে জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে সতীশদাও মুক্তি পেলেন।

পরবর্তীকালে সতীশদার প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো পিপিলস্ রিলিফ কমিটি।

বিনয় এবং নম্রতা আর কোন ছোট কাজকে অবজ্ঞার চোখে না দেখা—কমিউনিস্ট চরিত্রের এই গুণাবলী সতীশদার প্রতিটি কাজের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাঁর বলশেভিক নিষ্ঠা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ১৯৬২-৬৩ সালের দিনগুলিতে। সে সময় আদর্শে অটল কমিউনিস্ট নেতারা কারারুদ্ধ। সতীশদা তখন বাইরে। পার্টির সাধারণ কর্মীরা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামিল হয়েছেন। বন্দীমুক্তি ও গণদাবি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে তাঁরা সংগ্রামের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন। সেই সংগ্রামে সতীশদা সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে পার্টি সপ্তম কংগ্রেসে সংশোধনবাদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো, এবং নতুন কর্মসূচী গৃহীত হলো। তখন সেই কর্মসূচী কার্যকর করার অভিযানে সতীশদা সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। সেদিন থেকেই উদ্ভব হোল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এবং সেই পার্টিতেই সতীশদা তাঁর আসন নির্দিষ্ট করে নিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেই পার্টিরই সদস্য ছিলেন। পার্টির রাজ্য কমিটির তিনি দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন। পরে অসুস্থতার জন্য তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য থাকতে পারেন নি।

পার্টিই ছিলো তাঁর জীবন। পার্টি কাজের জন্যই সতীশদা তাঁর জীবন বিলিয়ে দিয়ে গেলেন। আদর্শের জন্য কিভাবে লড়াই করতে হয় তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন সতীশদা। (৩০শে ডিসেম্বর, '৭৩)

গণশক্তি (সান্ধ্য দৈনিক) ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৩। **দেশহিতৈষী** (সাপ্তাহিক) ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭৪

বিপ্লবী নায়ক সতীশদা

নির্মল মৈত্র

সতীশদাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রথম দেখি আমি ১৯৩০ সালে রাজসাহী জেলে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সহ আরো অনেকের সাথে। তার পরে ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে দেখলাম ডেকার্স লেনে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন। সস্নেহ ভালবাসায় টেনে নিয়েছিলেন, যখন জানলেন আমরা রাজশাহীর অনুশীলন দলের রিভোল্টিং গ্রুপের বেশীর ভাগ যুব কর্মীই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কাজে নেমেছি, শুনে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বিপ্লবী অনুশীলন দলের রিভোল্টিং গ্রুপের স্রষ্টা ও নেতা ছিলেন এই সতীশদা। তারপর ১৯৫১ সালে পশ্চিমবাংলার জেলখানা থেকে মুক্তির পরে কর্মকালে সব সময়ের সহযোগী হয়ে ১৯৭৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে, উপদেশ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে কাজ করে এসেছি। তাঁর মৃত্যু আমাদের মত কর্মীকে চরম ব্যথিত করেছে।

১৮৯৩ সালে ঢাকার নরসিংদি গ্রামে সতীশদার জন্ম হয়। ১৯০৫ সালে কিশোর বয়সে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের আলোড়ন তাঁকে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই কাজে চলার মুখে ১৯১১ সালে ধরা পড়ে প্রথম জেলে যান। অনুশীলন দলের সৃষ্টির পর মুহূর্তে, আত্মীয় বন্ধুদের সংস্পর্শে বিপ্লবী চেতনায় উদবুদ্ধ হয়ে অনুশীলন দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই কাজের প্রয়োজনে এবং দেশ প্রেমের প্রেরণায় আত্মীয়স্বজন বাড়িঘর ছেড়ে গোপন কাজের দায়িত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বৈপ্লবিক কাজে বাংলার যুব সমাজকে দৃঢ়চিত্ত, চরিত্রবান, সংগ্রামী, আত্মত্যাগী, দেশপ্রেমিক হিসাবে শিক্ষিত করে গড়ে তুলবার জন্য তখনকার যুক্তবাংলার জেলায় জেলায় আত্মগোপন করে বিপ্লবী যুব সংগঠন তৈরী করার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মহারাজ ত্রৈলক্য চক্রবর্তীর সাথে থেকে বহু দুঃখ কষ্ট অবমাননা সহ্য করে হাসি মুখে লক্ষ্যপথে চলেছেন। এই কাজে আমাদের

রাজসাহী জেলায় নাটোর, নওগাঁ, পুঁঠিয়া, আরানী, চারঘাট, হাঁপানিয়া এবং সদরে কোথাও গৃহশিক্ষকের কাজ, সরবতের দোকানদার, ফটো বাঁধান দোকানের কর্মী প্রভৃতি বিবিধ পেশায় অন্তগোপন করে আদর্শবান বিপ্লবী যুব সমাজকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ধনী অধ্যুষিত এই জেলায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বাস্থ্যবান বাছাই করা যুবককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে শক্তিশালী-অনুশীলন দল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ভাবে বহরমপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঢাকা প্রভৃতি জায়গায় বিপ্লবী যুব সংগঠন গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পযন্ত।

বিপ্লবীদের অনেক সময় দেশের প্রয়োজনে এমন কাজ করতে হয় যে কাজ তাঁদের আকাঙ্খিত নয়। সতীশদাকেও ১৯১৮ সালে রাজনৈতিক কার্যে অর্থের প্রয়োজনে যুবকদের নিয়ে রাজসাহী-নাটোরের ধরাইল গ্রামের এক ধনী সাহা বাড়িতে সংগঠিতভাবে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক সেদিন এই জেলা তোলপাড় করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল এবং বহু যুবককে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরেছিল।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ভারতে এবং বিশেষকরে যুক্ত বাংলায় পরপর অনেকগুলি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল। যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক মরিয়া হয়ে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সন্ধানে বহু ধর পাকড় ও অত্যাচারের মাধ্যমে সন্ত্রাস-সৃষ্টি করেছিল। এই সময় দল ও কর্মীদের নিরাপত্তার প্রয়োজন, কয়েকজন বিপ্লবী সহ সতীশদা আসামের গৌহাটিতে গোপন আশ্রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ এই গোপন আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে যায়। একদিন সশস্ত্র বিরাট পুলিশ বাহিনী বাড়ি ঘেরাও করে, দুপক্ষে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। সংঘর্ষের মধ্যে সতীশদা সহ কয়েকজন বিপ্লবী বহু কষ্টে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। অনেকে আহত অবস্থায় ধরা পড়ে জেলে যান। এই সশস্ত্র সংগ্রামে নলিনী বাগচী, প্রভাস লাহিড়ী, জিতেশ লাহিড়ী প্রভৃতি বিপ্লবীরা সতীশদার সাথে ছিলেন। পরে বসন্তে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ নলিনী বাগচীকে কলিকাতা মনুমেন্টের নীচে থেকে সতীশদা উদ্ধার করে গোপনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর ঠিক এই রকম সময়ের মধ্যে সতীশদা ধরা পড়ে যান।

....

১৯২১ সালে কংগ্রেসের নন-কো-অপরেশন মুভমেণ্ট, বিপ্লবী দলের রক্তাক্ত অভিযানের বিপর্যয় ঘটায়, নূতন উদ্যমে আবার বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সুরু হয়। সতীশদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈপ্লবিক প্রেরণায় সক্রিয়ভাবে এই প্রচেষ্টার দায়িত্ব নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবীরা কংগ্রেসে থেকে এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে চলতেন কাজের সুবিধার জন্য। সশস্ত্র বিপ্লবী কাজের প্রচেষ্টার প্রশ্নে অনুশীলন দলের মুখ্য বয়স্ক নেতৃত্বের সাথে আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নেতৃত্বের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি মোহ, বৈপ্লবিক কার্যে নিস্পৃহ, দোদুল্যমানতা, কর্মবিমুখতা, পুরাতন নেতৃত্বের মধ্যে প্রকট রূপে দেখা দিয়েছিল। দেশপ্রেমিক সতীশদা তাঁর বৈপ্লবিক লক্ষ্য সাধনের জন্য জীবনের উপর প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েই এই দোদুল্যমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

১৯২৮ সালে যুক্ত বাংলার বিপ্লবী যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করে 'অনুশীলন রিভোলিউশনারী গ্রুপ' তৈরী করে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভিযানকে এগিয়ে নেবার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তবাংলার প্রতিটি জেলার সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের নিয়ে বিপ্লবী দল সংগঠিত হয়েছিল। আমরাও তখন সতীশদার নেতৃত্বে বিদ্রোহীগ্রুপে যোগ দিয়েছিলাম।

১৯১১ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তার বিপ্লবী জীবনে, যে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছে, দলের নেতৃত্বের নির্দেশে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে নির্বিকার চিত্তে সেই কার্য সমাধা করে গেছেন। ব্যবহারে তিনি কোমল কিন্তু প্রয়োজনে ভীষণ ও কঠোর হতে পারতেন। দলের এবং দেশের শত্রুরূপে চিহ্নিত বৃটিশ চরকে হত্যা করতেও পরাঙ্মুখ হন নি। দুই একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের যেমন বসন্ত চাটার্জি প্রমুখ কয়েক জনের খবর ছাড়া আর সবই এখন পর্যন্ত কিংবদন্তী হয়ে আছে। তাঁর জীবন ইতিহাস লেখার সময় হয়তো আরো অনেক অপ্রকাশিত ঘটনা প্রকাশ হবে।

১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকা অবস্থায় বিদেশ থেকে বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়া প্রত্যাগত কয়েকজন বিপ্লবীর সাথে সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচনা হয়েছিল। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এবং শ্রমিক শ্রেণীর সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তাঁর হয়েছিল। মিরাট

ষড়যন্ত্র মামলা তাঁকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছিল। আলোচনার মাধ্যমে এ সবই সতীশদার মুখ থেকে শুনেছি।

১৯২৮ সালে মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলায় সতীশদা, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সহ আরো অনেক অগ্নিযুগের বিপ্লবী ধৃত হন। রাজসাহী সেণ্টাল জেল ও অন্যান্য জেল ঘুরিয়ে প্রেসিডেন্সী তাঁকে জেলে আনে। ১৯৩২ সালে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে সতীশদা সহ অনেককে আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যায়। এই ষড়যন্ত্র মামলায় সতীশদার ৮ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছিল

ক্রমে ক্রমে ভারতের দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের বেশীর ভাগ অংশকেই আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যায়। সেলুলার জেলেই কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার ও ডাঃ নারায়ণ রায়ের সংস্পর্শে এসে তাঁদেরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় সতীশদা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে পড়া শোনা আলাপ আলোচনা সুরু করেন। ওখানেও অনেক বাধা বিপত্তি ছিল। ক্রমান্বয়ে বেশীর ভাগ বিপ্লবীই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সতীশদার উৎসাহ প্রেরণাই অনেককে মার্কসবাদের পথে আসতে সাহায্য করেছিল। সেলুলার জেলে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষিত বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট "কনসোলিডেশনে" যোগদান করে যথেষ্ট পড়াশোনা করেছিলেন। গুরুমুখ সিং প্রমুখ সেলুলার জেলে যাবার পরে, তাঁদের কাছ থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে বৃটিশ শাসকদের আলোচনার খবর জেনে, ১৯৩৫ সালে দেশে ফিরিয়ে নেবার এবং মুক্তি দেবার দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট চালিয়ে ছিলেন। তাঁদের দাবির সমর্থনে ভারতে বিনাবিচারে আটক বন্দী শিবির ও জেলের রাজনৈতিক বন্দীরাও অনশন ধর্মঘট সুরু করেছিলেন। এইরূপ সর্ব্বাত্মক অনশন ধর্মঘটের চাপে তদানীন্তন সরকার আন্দামান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিল, পরে ব্যাপক গণ আন্দোলনে সকলকে মুক্তি দিয়েছিল।

১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে ঢাকার নরসিংদি গ্রামের বাড়িতে তাঁকে কিছুদিন নজর বন্দী করে রেখেছিল সরকার। সেই অবস্থাতেও তিনি জনসংযোগের মাধ্যমে সামাজিক অনেক কাজে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর একটানা দীর্ঘ নিঃস্বার্থ বিপ্লবী জীবন যাপন এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য দেশের সবাই তাঁকে ভালবাসত এবং সম্মান করতো। নজর বন্দী থেকে মুক্তি পাবার পরে তিনি ঢাকায় ঢাকেশ্বরী কাপড়ের কলে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত

করার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। এই কাজের সাথে সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে সোমেন চন্দ্র প্রমুখকে নিয়ে সাংস্কৃতিক চক্র তৈরী করেছিলেন। (সোমেন চন্দ পরে আততায়ীর ছোরায় নিহত হন।) নিরলসভাবে তিনি এখানে কাজ করে গেছেন এবং গোপন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে কলিকাতায় এসে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের এবং পার্টির হিসাব পত্র রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলা তথা ভারতে তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এরা তাঁর সুস্পষ্ট সাবলিল তাত্ত্বিক আলোচনায় মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির কাজে এবং কৃষক মজুর সংগঠনের সভা সমিতিতে বক্তা হিসাবে পশ্চিম-বাংলার সর্বত্র ঘুরেছেন।

মাউন্ট বেটন রোয়েদাদে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কলঙ্কের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বজায় রেখে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভারত স্বাধীনতা পেল। এক ভাগ হল ভারত আরেক ভাগ পাকিস্তান। কমিউনিস্ট পার্টিও অনন্যোপায় হয়ে কাজের সুবিধার জন্য দুই দেশে স্বতন্ত্র পার্টিতে পরিণত হল। নূতন করে পার্টিকে সংগঠিত করতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর মুহূর্তে হিন্দুস্থান সরকারের রোষবহ্নি প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির উপর পড়েছিল। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হয়েছিল। বহু কর্মী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক করেছিল। পার্টি সংগঠনের কাজ চালাতে বহুনেতা ও কর্মীকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল: সতীশদাও আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ধরা পরে স্বাধীন দেশের জেলখানায় বন্দী হন। যিনি স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বার বার কারাদণ্ডিত হয়েছিলেন, এবার স্বদেশী শাসনে সেই দেশ প্রেমিকই তাঁর দেশ প্রেমের চরম পুরস্কার পেলেন। প্রায় ৪ বৎসর জেলে বন্দী জীবন যাপন করে।

১৯৫১ সালের শেষ দিকে পশ্চিম বাংলার জেল থেকে সতীশদা মুক্তি পান। মুক্তি পাবার পরেই তিনি "পূর্ব বাংলা শহীদ কমিটির" সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গণ আন্দোলনের উপর চরম দমন নীতি চলছিল, বহু রাজনৈতিক কর্মীকে বন্দী করা হয়, অনেককে খুন করা হয়েছে। এক এক অঞ্চলে চরম সন্ত্রাস চালানো হয়েছে। এরই পরিপেক্ষিতে

এই কমিটির জন্ম। পূর্ববাংলা সম্বন্ধে এবং সেখানকার নির্যাতিত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সতীশদার অসীম দরদ ও সহানুভূতি ছিল। পূর্ববাংলার নির্যাতিত ও আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট কর্মীদের মামলা পরিচালনা, চিকিৎসা ও সাহায্যের প্রয়োজনে তাঁর সে কি আন্তরিক প্রচেষ্টা। রাজসাহীর নাচোল, ফরিদপুর, যশোহরের মামলা পরিচালনায় সর্বপ্রকারে সহায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহে সে কি অনলস প্রচেষ্টা, পূর্ববাংলার জন্য এই সময়ে তাঁর কাজের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক 'ভাষা আন্দোলনের' পরে পূর্ববংলার নূতন সরকার প্রতিষ্ঠা হল, অনেক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি হয়। এইরূপ সময়ে কর্মীদের একটা বিরাট অংশ আশ্রয়ের অভাবে সর্বস্ব খুইয়ে পশ্চিম বাংলায় আসতে বাধ্য হন। এই সময় সতীশদাকে দেখেছি আক্ষেপ করতে যে পূর্ব-বংলায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি ঘটতে চলেছে। পূর্ববাংলার কর্মীরা সর্বস্ব খুইয়ে পশ্চিম বাংলায় এসে উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। সতীশদা নিজের উদ্যোগে প্রায় সবার সাথেই দেখা করেছেন, সস্নেহ ভালবাসা দিয়ে প্রাণবন্ত আলাপ আলোচনায় করে ভরসা দিয়েছেন।

"পূর্ববংলা শহীদ কমিটির" মারফতে সাধ্যমত সাহায্য ও সহযোগিতা করে পূর্ব বাংলার কর্মীদের মনে প্রেরণা জাগাতে চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ কর্মী পরে পশ্চিমবংলার কমিউনিস্ট পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই কাজে সতীশদার অবদান কম নয়, দিনের পর দিন এদের সাথে তাত্বিক সুচিন্তিত সব রকম আলোচনা এবং স্বভাব সিদ্ধ সুমধুর ব্যবহারে ভবিষ্যতের রাস্তা ধরতে অনুপ্রাণীত করেছেন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পযন্ত সতীশদা বিশ্রাম সুখ শান্তি পরিহার করে এই সাহায্যের কাজে সব রকম প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁরই আন্তরিক উদ্যোগে 'বাংলা দেশ শহীদ স্মৃতি কমিটির' পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার গণআন্দোলনের উপর শাসক শ্রেণীর হিংস্র আক্রমণের মর্মান্তিক ঘটনা ও সাহসিক প্রতিরোধ ইতিহাসের পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল।

সতীশদা পশ্চিম বাংলার প্রাদেশীক কমিউনিস্ট পার্টির কন্ট্রোল কমিশনের সভ্য হয়েছিলেন, এম. এল. সি হয়ে বিধান পরিষদে গিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সাল থেকে পার্টির দায়িত্ব নিয়ে পিপ্‌লস রিলিফ কমিটিতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কার্য-

কর্মী কমিটিতে ছিলেন। দেখেছি তাঁকে এই রিলিফ সংগঠন পিপলস রিলিফ কমিটির কাজের মধ্য দিয়ে দুঃস্থ, অসুস্থ গরীব জনসাধারণ এবং কর্মীদের প্রতি দরদী ব্যবহার। তাঁর কাজের মূল্য ধারা ছিল, সবাইকে দায়িত্ব দিয়ে কাজের মধ্যে টেনে আনা। সমষ্টিগত কাজকেই তিনি সব সময় প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের কোনরূপ অহমিকা দেখিনি। সস্নেহ হাসি মুখে সবার সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন রাজনীতির ক্ষেত্র বিশেষ করে, কমিউনিস্ট আদর্শের ক্ষেত্রে 'অহমিকা' এগিয়ে চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

১৯৬২ সালে চীন ভারত সীমানা বিরোধ কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে আদর্শগত প্রশ্নে বিরাট দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। এ সময় দেখিছি সতীশদাকে তত্ত্বগত আলোচনা ও তথ্য নিয়ে দোদুল্যমান কমরেডদের সাথে দিনের পর দিন আলোচনা করতে। মার্কসবাদের আদর্শ থেকে পার্টিকে যারা জাতীয়তাদের অন্ধতায় টেনে নামাচ্ছিল তাদের হাত থেকে পার্টি রক্ষার জন্য কত চিন্তা কত ব্যাকুলতা। পুলিশী হামলা ও সন্ত্রাসের মধ্যেও ঝুঁকি নিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়েছিলেন সোস্যাল ডেমোক্রেসির বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

১৯৬৪ সালে বর্ধমানে সি.পি.আই. এম এর 'প্লেনামের' অধিবেশনে একজন সাচ্চা কমিউনিস্টের ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যার জন্যে তাঁর পরিচিত পার্টি সদস্য ও সমর্থক ও পার্টি দরদী পরিবারগুলি সঠিকভাবে মার্কসবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সতীশদার নেতৃত্বে, বাংলাদেশ শহীদ স্মৃতি কমিটির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। এদেশের তথা কথিত রাষ্ট্রনায়ক ও পত্রিকাগুলি যখন তারস্বরে চিৎকার করে বলছিল শেখ মুজিবরের নেতৃত্বেই বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছে সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ শহীদ স্মৃতি কমিটি পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সপক্ষে ঘোষণা করেছিল, বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছে দেশ ভাগের পরবর্তিকালে বহু শহীদের আত্মদানে। এই সংগ্রাম তারই পরিণত রূপ। এই কথা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করবার জন্য তাঁর উদ্যোগে 'বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে।

১৯৭০ সাল থেকে 'নকশালী' হঠকারী আন্দোলন দানা বাঁধতে সুরু করে। অতি বিপ্লবী বামপন্থী ইমেজের ধুম্রজালে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে, বামপন্থী গণ আন্দোলনের এক হাজারেরও বেশী কর্মী ও নেতাকে নির্বিচারে পুলিশের সহযোগিতায় হত্যা করেছে। সতীশদা 'নকশাল' আন্দোলনকে বলতেন, নেতৃত্বের মোহে মার্কসিজম্-কমিউনিজমের তত্ত্বের বিচ্যুতি ঘটিয়ে, উগ্রবিপ্লবীয়ানা দেখাতে গিয়ে মার্কসিজমকেই আঘাত করছে। শ্রেণী শত্রুর খপ্পরে পড়ে এবং শ্রেণী শত্রুর নির্দেশে তাদেরই পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সফল করেছে। নকশালরাই শত্রুপক্ষকে 'ফ্যাসিজমের' দিকে চলবার পথের সুযোগ করে দিয়েছে।

১৯৭২ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রহসন, ফ্যাসিস্ত কায়দায়—ভারতীয় দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সহযোগিতায়,—সন্ত্রাসের মাধ্যমে বহু লোককে এলাকাছাড়া করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের খুন করার ভিতর দিয়ে একচ্ছত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অসুস্থ শয্যাশায়ী হয়ে থেকেও সতীশদা যখন এই সব ঘটনা শুনতেন, তখন খুবই বেদনায় গম্ভীরভাবে বলতেন, আমাদের এখন থেকে সেই প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। আজ আমি অক্ষম-অসুস্থ, আপনারা সজাগ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলুন।

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে অসুস্থ অবস্থায় বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে মাজার হাড় ভেঙ্গে যায়। পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখানে কয়েক মাস মৃত্যুর সাথে লড়াই করে সে যাত্রা রক্ষা পান। চোখে ছানি পড়ায় আর কোন লেখা-পড়ার কাজ করতে পারতেন না। গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তায় কোন বিভ্রান্তি দেখা যায় নি। ধীরে সুস্থে সবরকম খবর জেনে নিতেন, সুচিন্তিত অভিমত জানাতেন।

তারপর ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তাঁকে পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল,—কিন্তু তিনি আর সুস্থ হয়ে ফেরেন নি। ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সালে চির-বিপ্লবী আজীবন ব্রহ্মচারী, প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক সংগঠক সংগ্রামী সতীশদার জীবন দীপ নিভে গেল।

বিপ্লবী সতীশদা লাল সালাম

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে, পিপলস রিলিফ কমিটির দপ্তরে সতীশ পাকড়াশীর ২য় মৃত্যু বার্ষিকীর সভার পঠিত : ৬ই জানুয়ারী ১৯৭৬ গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রবন্ধটি কিছুটা সংক্ষেপিত।